২.৮.৮৫

তিনকড়ি সামন্ত

প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

তিনকড়ি মাষ্টার

[illegible]

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

মহালয়া—১৩৩৭

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার বালক-পুত্র শ্রীমান অমল কুমার ইহার প্রচ্ছদ-পট আঁকিয়া দিয়াছে, সেজন্য তাহাকে প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

মহাকর

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

চো-চো	২৲
মাটির স্বর্গ	২৲
ধাঁধার উত্তর	১।০
'৭০৩'	১॥০
যৎকিঞ্চিৎ	১॥৶০
মুক্তাঝারি	১।০
স্ত্রী	১।০
বেড নম্বর ৩৯	২৲
প্রিয়তমাসু	২।০
জগদীশের দিকদারী (নাটক)	॥০
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)	
জমা-খরচ	১॥০
পথের স্মৃতি	২।০
'সকলি গরল ভেল'	১॥০
বরদা ডাক্তার	১৲
বসের নাড়	।/০
নীতি ও কাহিনী	।/১০
উই আর সেভেন্	২৲

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রজোপম—

ডাক্তার শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপহার।

তিনকড়ি মাষ্টার

এত তাড়াতাড়ি করিয়াও তিনকড়ি পারিয়া উঠিল না। মোড়ের মাথায় আসিয়া কাপড়ের দোকানে ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। এখান হইতে স্কুলটুকু পৌঁছিতে আরও পাঁচ মিনিট লাগিবে। সুতরাং আজও তাহার দশ মিনিট লেট-য়্যাটেনডান্স। নাঃ! আর সে পারে না। সময় যেন তাহার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া শত্রুতা লাগাইয়া দিয়াছে। আজ সে স্নানও করে নাই। স্নানের সময়টা বাঁচাইয়া আধপেটা খাইয়া—খাওয়া ঠিক বলা যায় না—গিলিয়া, তুফান মেলের গতিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। তবুও দশ মিনিট লেট্!

হাজিরা খাতায় নাম সহি করিতে গেলে, হেডমাস্টার বলিলেন, আপনাকে স্কুলের চেয়ারে বসিয়ে রাখা, আমার সাধ্যে আর কুলাল না, তিনকড়ি বাবু। একে ত ম্যানেজিং কমিটী

আপনার ওপর যে রকম খাপ্পা, তার ওপর নিত্যই যদি এই রকম—"

নিত্যকার একই সেই পুরাণো কথা। তাহার বিরুদ্ধে এই পরিচিত অভিযোগ শুনিয়া শুনিয়া তাহার কাণে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনকড়ি মন্থর পদবিক্ষেপে হেডমাষ্টারের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার ক্লাসে ঢুকিল।

একটা ছেলে বাঙ্গালা বইখানা হাতে করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সার, 'পক্ষিগণ', 'ক্ষ'তে ঈ হবে ত, কিন্তু হ্রস্ব ই করেছে।" ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া তিনকড়ি কহিল—"বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌গে যা।" বলা বাহুল্য, ছেলেটি বেঞ্চির উপরও দাঁড়াইল না, বেঞ্চির নীচেও দাঁড়াইল না, তাহার প্রতি শিক্ষক মশা'য়ের এই বে-আইনী কার্য্য দেখিয়া ভাবিল যে, তাহার দোষ না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক যেখানে তাহার উপর স-উপদ্রব আইন অমান্য করিতে পারেন, সেখানে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন দ্বারা নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার অধিকারটা তাহার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং সে সটান গিয়া তাহার জায়গায় বসিয়া পড়িল।

চারিটার সময় স্কুলের ছুটী হইলে তিনকড়ি গেটের বাহিরে আসিয়া ময়লা খাকী-টুইল স্যার্টের বুকপকেট হইতে বহুদিনের সযত্ন সঞ্চিত বহুবিধ টুকরা কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে একখানি

সন্তর্পিত খবরের কাগজের 'কাটিং' বাহির করিল এবং সেই বহুবারের পঠিত কর্ম্মখালির ছোট্ট বিজ্ঞাপনটুকুর ভাঁজ খুলিয়া আবার তাহা মনে মনে পাঠ করিল।

টুইসনির বিজ্ঞাপন। সকালে ৩টি ছেলেকে তুই ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হইবে, মাহিনা ১২৲ টাকা। সকালে তিনকড়ির তুই জায়গায় তুইটি টুইসনি আছে। পাঁচ টাকা হিসাবে তুই জায়গায় দশ টাকা পায়। প্রত্যেক স্থানে দেড় ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার কথা; কিন্তু তুই বাড়ীর পড়ানো সারিয়া ঘরে ফিরিতে তাহার প্রায়ই দশটা বাজিয়া যায়। সুতরাং একদিকে যেমন পুরা এক ঘণ্টা সময়ও তাহার হাতে থাকে না, অপরদিকে তেমনই তিনটি কায তাহার মাথায় চাপিয়া থাকে; অর্থাৎ স্নান, আহার এবং স্কুলের এক মাইল পথ হাঁটা। তাই, খুব তাড়াহুড়া করিয়াও তিনকড়ি প্রায়ই স্কুলে লেট্ হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায়ও নাই। সকালের টিউসনি ছাড়িলে, শুধু সন্ধ্যার টিউসনি আর স্কুলের মাহিনায় সংসার চলে না। আর তুবেলার টিউসন রাখিয়া স্কুল ছাড়া—সে-ত একেবারেই অচল।

তাই তিনকড়ি চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, যদি এই পড়ানোটা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে তুই দিক দিয়া লাভবান হয়;—তু'টা করিয়া টাকাও বেশী আয় হয়, আর স্কুলে আসিতেও কোন দিন লেট্ হয় না। কিন্তু হইবে কি?—নীহাররঞ্জন দত্ত;

নামটা শুনিয়া মানুষটিকে ত মোলায়েম বলিয়াই মনে হয়। কত লোক হয় ত উমেদার হিসাবে হাজির হইবে, খুব হওয়ার সম্ভাবনা—যা'ক্, দেখাই যা'ক্ না ভগবান্ কি করেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই তিনকড়ি নীহারবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তিনকড়ির ধারণাই ঠিক। নীহারবাবু লোকটি মোলায়েমই বটে। তিনকড়ির চাকুরী হইয়া গেল। তাহার অন্ধকার ভাবা মনটা একটু উজ্জ্বল আর হাল্কা হইয়া উঠিল। ব্যবস্থা হইল, পরদিন হইতেই সে নীহারবাবুর ছেলে তিনটিকে পড়াইবে। কিন্তু এক বিষয়ে একটু সঙ্কট দেখা দিল। সকালের দুই জায়গায় টুইসনির গতমাসের বেতন এখনো সে পায় নাই। এমাসেরও দশ দিন হইয়া গিয়াছে। কায ছাড়িয়া দিলে এই এক মাস ১০ দিনের মাহিনা পাইবার আশাটাও হয় ত তাহাকে ছাড়িতে হইবে। হয় ত কেন, নিশ্চয়ই ছাড়িতে হইবে। কারণ, এ পর্য্যন্ত তাহার কাণে এ সংবাদটা পৌঁছায় নাই যে, কায চুকাইয়া দিবার পর কেহ তাহার পূর্ব্বের পাওনা চুকাইয়া পাইয়াছে। অথচ মাহিনা পাইবার অপেক্ষায় থাকিলে নূতন কাযটি হাতছাড়া হইয়া যায়। যাহা হইবার হইবে, নূতন কাযটি সে ত্যাগ করিতে পারে না। স্কুলে সে আর লেট্ হইবে না। ইহার জন্য গোটা ১০।১২ টাকা ক্ষতি হয়—হউক, সুতরাং

[illegible] হইতেই তিনকড়ি নীহার বাবুর গৃহে নিয়মিত পড়াইতে শুরু করিয়া দিল।

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। স্কুলে তিনকড়ির আর কোন-দিনই লেট্ হয় না; এদিকটায় সে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন সে গায়-মাথায় তেল মাখিয়া স্নান করিবার সময় পায় এবং খাইতে বসিয়া কি খাইতেছে এবং তাহাতে নুণ-ঝাল ঠিক হইয়াছে কি না ইত্যাদি বুঝিবার অবকাশ পায়। কিন্তু এত দিন পরে, যে পথটাকে সে নিরাপদ ও নির্ভর ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, সেই পথ হইতেই বিপদ ও ভয়ের একটা প্রবল ঝঞ্ঝা আসিয়া হঠাৎ একদিন তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। টিফিনের পর সেক্রেটারী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তিনকড়ি বাবু, আমাদের এ ছোট স্কুলে আপনার কাযের সুবিধা হবে না; আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। লিখিত নোটীশ পাবেন এখন; আপাততঃ মুখের নোটীশটাই শুনে নিন।"

তিনকড়ির পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল; চারিদিক হইতে একটি কাল পর্দ্দা তাহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিয়া জমিয়া উঠিল। তিনকড়ি কহিল, "আজ্ঞে, আমার ত আর লেট্—

"আহা-হা, লেট্ ত ছিল ভাল; এ যে লেটের বাবা! ক্লাসে

পড়াশুনা একেবারে কিছু হয় না। আর কিছু দিন আপনার দ্বারা ক্লাস চল্‌লে, ছেলেগুলো বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত ভুলে বসবে।"

"আজ্ঞে, আমি ত—"

"যান, যান; আপনি আর কাটাতে চেষ্টা করবেন না। আজকালকার অধিকাংশ মাষ্টার মশাইরা ফাকিবাজ বটে; কিন্তু তাহলেও তাঁরা আট আনা ফাঁকি দেন, আট আনা কায করেন; কিন্তু আপনি ষোল আনাই ফাঁকি দিয়ে আসছেন। শুনলুম, ক্লাসে চুপ করে খালি বসে থাকেন আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন। মাসের পর মাস স্কুলের অর্থ হস্তগত করে পরমার্থিক চিন্তা করবার স্থান এ নয়।"

সকাল ছয়টা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি ও পরিশ্রম করিয়া তিনকড়ি মাসে পঞ্চাশটা টাকাও আয় করিতে পারিত না। সে টাকার আবার তিন ভাগের এক ভাগ যাইত বাসা-ভাড়ায়। সুতরাং বাকী ৩০।৩২ টাকায় কলিকাতা সহরে পাঁচ-সাতটি পোষ্যের ভরণপোষণের চিন্তা, পরমার্থিক নয় বটে, তবে তাহা যে পরম এবং আর্থিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সেক্রেটারী তাঁহার দৃষ্টির সব বিষটুকু নিঃশেষে তিনকড়ির উপর ঢালিয়া দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "এই পরীক্ষার ফল থেকেই বোঝা যাবে এখন, আপনি ক্লাসে কি রকম পড়ান।"

তিনকড়ি মাষ্টার

তিনকড়ি ক্লাস থ্রী, ফোর আর ফাইভে বাংলা পড়ায়। আজ পরীক্ষার প্রোগ্রাম বাহির হইয়াছে, এই তিন ক্লাসের বাংলা পরীক্ষা লইবেন, শশাঙ্কবাবু।

আসন্ন পরীক্ষা তিনকড়ির মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। যে ভয়টা ছাত্রদেরই হয়, আজ তাহা শিক্ষকের অন্তর কাঁপাইয়া তুলিল। অধিকাংশ ছাত্রই যে ফেল হইবে, তাহা সে বেশ বুঝিত। অর্থের টানাটানিজনিত সাংসারিক দুশ্চিন্তায় যে নিজেকে পর্য্যন্ত দেখিবার অবসর পায় না, সে ছাত্রদের পড়াশুনা দেখিবে কি করিয়া। অন্ন-চিন্তাই যাহার সব, অন্য চিন্তা তাহার কোথায় ?

ছাত্রের উপর তাহার রাগ হইল। সে না হয় পড়াতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা বাড়ীতে পড়াশুনা করে না কেন ? তাহাদের অধিকাংশের বাড়ীতে ত মাষ্টার আছে। তাহারা ভাল করিয়া পড়াইয়া দিলেই ত হয়। যত দোষ, নন্দ ঘোষ। ২৮৲ টাকায় সে আর কত করিবে ? সারা দিনের মধ্যে স্কুলের এই পাঁচটা ঘণ্টাই তাহার ক্লান্ত দেহ যা একটু বিশ্রাম পায় ; তাহার মন কিন্তু তাহাও পায় না সুতরাং……

কয়েক দিন কাটিয়া গেল।—আগামী সোমবার হইতে নীচের ক্লাসগুলার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। চারিটার পর স্কুল হইতে বাহির হইয়া, তিনকড়ি হন্ হন্ করিয়া নীহারবাবুর বাসার

দিকে চলিতে লাগিল। দুই দিন সেখানে পড়াইতে যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া নয়; নীহার বাবুই বারণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—'ছেলেরা মাসীর বাড়ী যাবে, দু'দিন আর আসবেন না।' ছেলেরা আসিল কি না—সে খবরটাও লওয়া দরকার আর তাহা ছাড়া একটা বড় দরকার আছে। গতমাসের বেতন বার টাকা সে এখনো পায় নাই। এ-মাসেরও বার চৌদ্দ দিন হইয়া গেল। নীহারবাবু বলিয়াছেন,—দুটো দিন বাদে ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে গতমাসের মাহিনাটা দিয়া দিবেন। টাকাটা আজ পাওয়া গেলেই ভাল হয়। দু'মাসের ঘর-ভাড়া জমিয়া গিয়াছে। উঠ্‌নার দোকানে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা না দিলে আর সেখানে মাথা-গলানো যাইবে না। বারটা টাকা ত দিবে, তাহাতে আর কিই-বা হইবে, এ মাসের পাওনা হইতে কিছু লইয়া অন্ততঃ গোটা পনর যদি নীহারবাবু দেন, তাহা হইলে কোনমতে সে ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতে পারে। নীহারবাবু লোক খুব সজ্জন, ভাল করিয়া ধরিয়া বসিলে দিতেও পারেন।

ভাবিতে ভাবিতে তিনকড়ি নীহারবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল; দেখিল, বৈঠকখানার দরজা খোলা; ভিতরে পাঁচ ছয় জন লোক দাঁড়াইয়া, তন্মধ্যে গানের মাষ্টার সত্যবাবুও আছেন। তিনি নীহারবাবুর মেয়েদের গানের মাষ্টার, বিকালে

এই সময়টাতে রোজ গান শিখাইতে আসেন। দু'একদিন সকালে আসিয়াছিলেন ; তাহাতেই তিনকড়ি সত্যবাবুকে জানে। তিনকড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে সত্যবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনার পিঠে ক'ঘা পড়লো মশাই ?"

তিনকড়ি হেঁয়ালী কিছুই বুঝিল না। সত্যবাবু কহিলেন, "আরে, আপনারও নিশ্চয় কিছু পাওনা বাকী আছে ত ? ইনি কিন্তু পলাতক !"

পলাতক ! কে ? নীহারবাবু ?—তিনকড়ি থতমত খাইয়া নিজের মনেই প্রশ্ন করিল, আর ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পারিয়া সত্যবাবুর মুখেরদিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

একটি ভদ্রলোক, তিনি এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালা, ভবানীপুরে থাকেন, তিনি একটি টানা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের দশ-পনর ওপর দিয়ে গেছে, আমার মশায়, তিনটি মাসের ভাড়া ; 'প্রায় দুটি শ' টাকা !"

হেঁয়ালীর সমাধান হইল। তিনকড়ি বুঝিল, তাহার 'সজ্জন' নীহারবাবু কথঞ্চিৎ অসজ্জনতা করিয়া বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য পাওনাদারদিগের পাওনা না দিয়া, রাতা-রাতি অদৃশ্য হইয়াছেন। কলিকাতা সহরে ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ; খুব আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কিছুই নাই।

তথাপি তিনকড়ির চক্ষুর সন্মুখে একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় হরিদ্রাবর্ণের ফুল নিমেষে ফুটিয়া উঠিল এবং সে জানালার ধাপের উপর বসিয়া পড়িল।

উঃ! চুলোয় যা'ক, বাড়ীওয়ালার ছু'শো টাকা। তার দু'হাজার দশ হাজার আছে, দু'শো গেলে কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার যে!—তিনকড়ির দেহ যেমন লুটাইয়া পড়িল, মনও তেমনি লুটাইয়া পড়িল। সকালে ছু'জায়গায় দশ টাকা তাহার বাঁধা ছিল। এখনও সে-ও গেল, এ-ও গেল। স্কুলের কাযও টল্‌মল্ করিতেছে। তরঙ্গোদ্বেলিত মরণের মহাসাগরে সে অবলম্বনস্বরূপ একগাছা তৃণেরও আশা দেখিল না। ডুবিয়া মরিতে পারিলেও সে অতলের স্নিগ্ধশয্যায় বিশ্রাম পায়। আর সে পারে না। সে কি করিবে!

ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মাথার উপর ভাঙ্গিয়া-পড়া অনন্ত আকাশের চাপে নুইয়া পড়িয়া তিনকড়ি মাষ্টার মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল; কহিল—"খুব কড়া করে এক কাপ চা।" আজ আর সে বাসায় যাইবে না। পার্কে একটু বসিয়া, সন্ধ্যা হইলে একেবারে পর পর ছু'জায়গায় পড়ানো শেষ করিয়া বাসায় ফিরিবে।

চা খাইতে খাইতে সে-দিনের খবরের কাগজখানা সে টানিয়া লইল। সম্মুখের পৃষ্ঠাতে বড় বড় অক্ষরের হেডিংয়ে কংগ্রেসের

কলিকাতা অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। সে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞানে সে পাতা উল্টাইল। পরের পাতায় হিটলার ও চেম্বারলেনের প্রকাণ্ড ছবির সঙ্গে আসন্ন মহাযুদ্ধের জরুরী সংবাদ। কোনও দরকার নাই। সমস্ত জগৎ রসাতলে যাক্ কিম্বা থাক্, তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। খেলাধূলার কথা—সম্পূর্ণ বাজে। ভাওয়াল মামলা—জাহান্নমে যাক্। সমস্ত কাগজখানার মধ্যে কর্ম্মখালির পাতাটাই একমাত্র আবশ্যকীয় ও মূল্যবান। তিনকড়ি সেই পাতাটা বাহির করিয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে সুরু করিল।

অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিলে, স্ত্রী নন্দরাণী মুখখানা ভার করিয়া শ্লেষের ভঙ্গীতে কহিল—"আজ বুঝি স্কুল থেকে বরাবর ছুট্‌কীদের বাসায় গিয়েছিলে? পড়াতেও বোধ হয় আজ যাও নি?"

ছুট্‌কী নন্দরাণীর মামাতো বোনের ডাকনাম। বয়সে তাহার অপেক্ষা দু'এক বৎসরের ছোট। তাহারই সহিত তিনকড়ির প্রথম বিবাহের কথা স্থির হয়। তাহার পর কি কারণে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে তিনকড়ির মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে তখন প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সংকল্প করে এবং পরে আই, এ ফেল করে।

তাহার পর দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু নন্দরাণীর

বিশ্বাস, তিনকড়ি এখনও তাহার ভগ্নিকে ভুলিতে পারে নাই এবং সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহার ভগিনীপতি শ্যামলালের বাসায় গিয়া থাকে। কথাটার ভিতর হয় ত সত্য থাকিতে পারে; হয় ত তিনকড়ি সময় ও সুবিধা পাইলে শ্যামলালের বাসায় গিয়া থাকে। কিন্তু সে যাওয়ার ভিতর পূর্ব্বেকার কোন আকর্ষণ বা মোহ যে আর নাই, তাহাও সত্য।

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নন্দরাণী পুনরায় কহিল—"কেমন আছে ওরা সব? শ্যাম বুঝি বাসায় নেই? মফঃস্বলে গেছে। তা আমি ভাবলুম, রাত্তিরে ঐখানেই থাকবে, তাই এ-বেলা আর রান্না করিনি।"

"রান্না-বান্না করনি—"

"না।"

"ছেলেরা কি খেলে?"

"ও-বেলার জল-দেওয়া ভাত ছিল, তাই সব খেয়েছে। তুমি ওখান থেকেই খেয়ে এসেছ নিশ্চয়?"

"আমি ওখানে যাই নি।"

"যাও নি?"

"না।

"তা হ'লে এত রাত পর্য্যন্ত—"

ক্রোধ, বিষাদ এবং গাম্ভীর্য্যভরা মুখে তিনকড়ি কহিল—হ্যাঁ

স্কুলের পর একটু কাযে যেতে হয়েছিল। তারপর পাড়ুয়ে আমাদের মৌলভী সাহেবের বাসায় গিয়েছিলুম।"

শ্লেষভরা কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—"মৌলভী সাহেবের বাসায়?"

"হ্যাঁ; এই টুপীটা আনতে"; বলিয়া তিনকড়ি হাতের একটা ফেজ টুপী তাকের উপর রাখিয়া দিল। তারপর জামা কাপড় ছাড়িয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

নন্দরাণী ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মেঝেরই একধারে একখানা কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত উভয়েরই চোখে ঘুম আসিল না। এক জনের চিন্তা—স্বামীর সম্বন্ধে। তাঁহার অন্য নারীতে আসক্তি, অবৈধ প্রণয়, স্ত্রীর সহিত ছলনা প্রভৃতি। অপরের চিন্তা—সংসার সম্বন্ধে: কি করিয়া অভাব-অনটনের নিষ্ঠুর পেষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। সকালের পড়ান দুইটা কে অশুভক্ষণেই ত্যাগ করিল। সেখানে এক মাস দশ দিনের মাহিনাটাও মারা গেল। স্কুলের কাজটাও যায়-যায়। গোটা বছর সে কিছুই পড়ায় নাই, সুতরাং ছেলেগুলো যে ফেল্ করিয়া

বসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং—দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। কাল সকালে উঠিয়াই পার্ক সার্কাসে সে যাইবে। সকালে ঘণ্টা দেড়েক; কুড়ি টাকা। এই কাযটা যদি লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আর কথাই নাই। একটু দূর। হউক—কুড়ি টাকা পাইলে একটা ট্রামের মান্থলী করিতে পারা যাইবে।

*　　　*　　　*

"আপনি একটু বসুন, মিনিট পনর মধ্যেই সাহেব আসছেন।"

"ঘুমুচ্ছেন কি?"

"না, গোসল কচ্ছেন; আপনার কথা তাঁকে সব বলিছি।" পার্ক সার্কাসে একটি ছোট্ট সুন্দর বাড়ীর সুসজ্জিত বৈঠকখানা। আগন্তুক একটি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে একটি লুঙ্গী-পরা মুসলমান ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"আপনি ঐ টিউসনির জন্যে এসেছেন ত?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"দেখুন, আমার ছেলেটি ছোট, সামান্য কিছু পড়ে। তবে বেশ যত্ন নিয়ে পড়াতে হবে।"

"সে আপনাকে বলতে হবে না। কাযে না হয় ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু খোদার কাছে ত আর ফাঁকি চলবে না।"

"সে ত ঠিক কথা। দেখুন, দশটা টাকা দিলে হাজার হাজার হিন্দু মাষ্টার পাওয়া যায়। কিন্তু আমি কুড়ি টাকা করে দেবো, তার মানে—

"সে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মেহেরবাণী হ'লে, আমি এক মাসের মধ্যেই আমার কাযের তারিফ্ আপনাকে দেখিয়ে দেবো।"

"তা ভাল; আপনার নামটা কি?"

"মহম্মদ একবাল হোসেন।"

উভয়ের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পর এই স্থির হইল যে, একবার হোসেন পরদিন হইতেই এখানে সকালে সাড়ে সাতটায় পড়াইতে আসিবেন। বেতন কুড়িটাকা।

ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া, অতীতের তিনকড়ি, বর্ত্তমানের একবাল হোসেন, জামার পকেট হইতে টুইসনির ছোট বিজ্ঞাপনটুকু বাহির করিয়া আর একবার পাঠ করিল—'একটি নয় বছরের ছেলেকে সকালে এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার জন্য একজন মুসলমান শিক্ষক দরকার। বেতন ২০৲। মহবুব রহমান, ৩৬ সি, পার্ক সার্কাস।'

গতকল্য চায়ের দোকানে চা খাইতে খাইতে বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া সকলের অলক্ষ্যে তিনকড়ি ইহা ছিঁড়িয়া লইয়া পকেট-জাত করিয়াছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া তিনকড়ি বিজ্ঞাপনটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। হঠাৎ সে একি কাণ্ড করিয়া বসিল! দারুণ অভাবের কষাঘাতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, সে যে-পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখন যখন চমক হইল, তখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে গ্লানি ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা তাহার বার বার মনে পড়িল,—

'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

কবিতাটা তাহার মনে মনে অনেকটা বল সঞ্চয় করিল। সে ভাবিল, দুঃখের সহিত সংগ্রামে সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া, এই যে ক্ষতবিক্ষত দেহে ক্রমাগত যুঝিয়া যাইতেছে, ইহাই তাহার ইহজীবনের বীরত্ব। এই বীরত্বের যদি পুরস্কার থাকে, তবে সে গর্ব্বিত-বক্ষে ভগবানের কাছ হইতে পরজন্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবে। দুঃখের সহিত সংগ্রামে সে কখনও দুর্ব্বলের মত অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে নাই। কিন্তু কাল বিজ্ঞাপনটি পড়িবার পর কেন যে তাহার অন্যায় লোভ আসিল, কেন একটা অনুচিত উৎকট

আগ্রহ আসিয়া তাহার মনকে নাচাইয়া দিল, কেন সে মিথ্যা কথা বলিয়া মৌলভী সাহেবের ফেজটুপীটা চাহিয়া আনিল, আর কেনই বা পার্ক সার্কাসে ছুটিয়া একবাল হোসেন নামের ছদ্ম আবরণে নিজেকে গোপন করিল—সেই কথা যা ভাবিয়া অন্তরে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল।

ট্রাম হইতে নামিতেই মোড়ের মাথায় শ্যামলালের সহিত দেখা হইল। শ্যামলাল কহিল—"দাদার যে আর দেখা পাবারই যো নেই! ক্রমেই দেখছি তুমি ডুমুরের ফুল হ'য়ে দাঁড়ালে।"

তিনকড়ি কহিল—"মরবার সময় নেই ভাই, তা তোমাদের ওদিকে যাব কি করে বল। অনেক কাল তোমাদের বাসায় যাওয়া হয় নি বটে, সব ভাল আছে ত' ?"

"ভাগ্যিস্ দেখা হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করলেন। তাই ত দিদিকে বল্‌ছিলুম যে, এই কাছে বাসা এক দিন—

"তুমি কি আমাদের বাসায় গিয়েছিলে না কি ?"

"সেখান থেকেই ত আসছি। দিদি—বল্‌লেন—একলার সংসার, কাযের ঝঞ্ঝাট, কি করে যাই বল। তোমার দাদা ত প্রায়ই যান।' আমি বল্লুম—হ্যাঁ, দাদা ত প্রায় রোজই যাচ্ছেন।"

তিনকড়ির অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। উঃ! ভগবান!

তুমি যাকে মার, কোন্ ফাঁকে কি করে যে মার, মানুষের তা বুঝে ওঠা শক্ত। শ্যামলাল কহিল—"দাদা, চুপ করে রইলেন যে?"

"তা তোমার দিদি কি বল্লেন শুনে?"

"কিছু বল্লেন না রান্না-ঘরের দিকে চলে গেলেন। দিদির মুখটা বিষম ভার-ভার দেখ্লুম; ঝগড়া-ঝাটি করেছেন না কি?"

আর দু'একটা কথাবার্ত্তার পর উভয়ে উভয়ের বাসার অভিমুখে চলিয়া গেল।

তিনকড়ি বাসার কাছ-বরাবর আসিয়া দূর হইতে দেখিল, তাহার কাবুলী মহাজন হায়দার খাঁ তাহার দীর্ঘ লাঠিগাছটার উপর ভর দিয়া তাহার বাসার সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। আজ রবিবার, ৩-মাসের দরুণ সুদের দুইটা টাকা আজ তাহাকে বিনা ওজরে দিবার কথা। কয়দিন নানা অজুহাতে তাহাকে বিদায় করিয়াছে, আজ আর কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না। তাহার দীর্ঘ লাঠিগাছটিকে হয় ত টলানো সম্ভব, কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘ হায়দার খাঁর দেহ, সুদের টাকা না পাইলে আজ এক পাও যে টলিবে না, তাহা তিনকড়ি বুঝিল। কিছু ভাবিবারও সময় নাই, যুক্তি খাটাইবারও অবকাশ নাই। কাছে আসিতেই হায়দার বজ্রকঠিনস্বরে কহিল—"বাব্বু, দো ঘণ্টা খাড়া হায়, রোপেয়া ল্যাও।"

তিনকড়ি ঢোঁক গিলিয়া কহিল—"তোমরা ওখানেই ত গিছলুম। আউর চার রোপেয়া আজ হামকো দিতেই হবে, বহুৎ জরুর দরকার হ্যায়। উস্ সে—তোমরা সুদকো দো রোপেয়া কাট লেকে, বাকী দো রোপেয়া হামকো দে দেও। সমজা ?"

হায়দারের মুখে একটু প্রফুল্লভাব ফুটিয়া উঠিল। কর্জ্জের খাতাখানা তাহার কাছেই ছিল। পাশের গলির মধ্যে গিয়া খাতায় লিখাইয়া লইয়া, হায়দার তিনকড়ির হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিল—"এ মাহিনাসে ড়াই রোপেয়া সুদ চলে গা।" তিনকড়ি টাকা দুইটা পকেটে রাখিয়া মনে মনে ভাবিল, এখনকার বিপদ্ ত এড়াই, তারপর 'ড়াই'এর ভাবনা পরে ভাবা যাবে। হায়দার আর একবার শুনাইয়া দিল—'ষোলো থা, আবি বিশ হুয়া ; সম্‌জা ?"

বাসায় ঢুকিয়া তিনকড়ি দেখিল, নন্দরাণীর মুখখানা কালো হাড়ি হইয়াছে। বুঝিল, শ্যামলালই ঘটাইয়া গিয়াছে। এই রকমই হয়। দুঃসময়ে আঁধার যখন মানুষকে ঘিরিয়া চলে, তখন বিনা মেঘেই তাহার মাথার ওপর বজ্রাঘাত পড়ে! তবে সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে নন্দরাণীর খুব বেশী রাগ হইলে সে একেবারেই বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের মনে গুম্ হইয়া থাকে। মাঝারী-গোছের রাগ হইলেই সে

ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। আজ নন্দরাণার রাগ চরমে উঠিয়াছে, সুতরাং তিনকড়ি দেখিল, ঝগড়া-ঝাটির কোন ভয় নাই। সে নীরবে স্নানাহার সারিয়া লইল। তাহার পর কাবুলীর টাকা দুইটি হইতে একটি টাকা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কাল হইতে স্কুলের পরীক্ষা সুরু হইবে। তাহার ক্লাসের ছেলেরা যাহাতে বেশী সংখ্যায় ফেল্ না করে, সে সম্বন্ধে একটু তদ্বিরের আবশ্যক। তদ্বির মানে—শশাঙ্কবাবু, যিনি ক্লাস থ্রী, ফোর, ফাইভের বাংলা পরীক্ষা লইবেন, তাঁহাকে একটু খুসী করা। শুধু মুখের কথায় খুসী করিতে যাওয়ায় বিশেষ ফল হয় না। তাই অনেক ভাবিয়া, যাহা করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তিনকড়ি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। যে কোন উপায়ে স্কুলের কাজটা তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। স্কুলের কাজ গেলে, এই প্রবল স্রোতে তাহার নৌকা বানচাল হইয়া যাইবে।

তিনকড়ি বরাবর বাজারে গেল। দশ আনায় এক কুড়ি হাঁসের ডিম আর পাঁচ আনায় সওয়া সের পাটালি গুড় কিনিয়া সে শশাঙ্কবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল।

হঠাৎ তিনকড়িকে এই অবস্থায় দেখিয়া শশাঙ্কবাবু কহিলেন, "ব্যাপার কি, তিনকড়ি বাবু ? ?"

মেজের একধারে ডিম আর গুড় রাখিয়া তিনকড়ি

কহিল,—"ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়; এক বন্ধু দেশ থেকে এনেছেন। আমার স্ত্রীর অম্বলের মাদুলী হাতে, হেঁসেলে ডিম ঢোকাবার উপায় নেই। তাই কতক দিলুম ভায়রাভাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে, আর কতক নিয়ে এলুম আপনার জন্যে। জানি, আপনি ডিমটা খুবই ভালবাসেন। এই ব্যাপার। আর শুধু ডিম দিতে নেই, তাই ওই যৎসামান্য একটু পাটালি গুড়। ওদের দেশের গুড় ভারি চমৎকার, টেস্ট্ করেদেখ্‌বেন একটু।"

অতঃপর অন্য কথা চলিল। আসল কথা পাড়িবার ধার দিয়াও তিনকড়ি গেল না। মুখ্য কথাটাকে গৌণের মধ্যে আনিয়া ফেলিবে, এই তাহার মৎলব। শেষকালে শশাঙ্ক বাবুই কথায় কথায় কহিলেন—"কাল থেকে ত স্কুলের পরীক্ষা সুরু হবে।"

তিনকড়ি কহিল,—"হ্যাঁ, পারা যায় না দাদা আর স্ত্রীর অসুখের জন্যে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।" বলিয়া তিনকড়ি যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল— ক'টা ক্লাসের বাংলা আপনার ওপরেই পড়েছে বোধ হচ্ছে। দেখ্‌বেন একটু দাদা, ছেলেগুলো বেশী যেন ফেল না করে। সেক্রেটারী আমার ওপর যে রকম সদয়—একটু খুঁত পেলে আর রক্ষে নেই।" খুব সাধারণ ভাবেই তিনকড়ি কথা কয়টা বলিয়া চলিয়া আসিল।

স্কুলের আসন্ন বিপদে এখন কিন্তু সে অনেকখানি ভরসা

পাইল। মনে মনে ভাবিল, ইহাতেই অনেকটা কায হইবে; এই পনর আনা পয়সাতেই তাহার পনর আনা রকম ফাঁড়া এ ক্ষেত্রে কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু মানুষের যখন ভাগ্য খারাপ হয়, তখন মুঠোর কড়িও উড়িয়া যায়। পরদিন স্কুলের পরীক্ষা আরম্ভ হইলে দেখা গেল —এক অসাধারণ ব্যাপার। শশাঙ্ক বাবুর পরিবর্ত্তে সেক্রেটারী নিজেই ছেলেদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তিনকড়ি একেবারে থ হইয়া গেল। সংবাদ লইয়া জানিল, তাহার তিন ক্লাসের বাংলার পরীক্ষা এবার সেক্রেটারীই লইবেন। প্রথমটা তিনকড়ি একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পর তাহার মনে খুব ক্রোধের উদয় হইল। সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং স্থির করিল, যে-সব ক্লাসের পরীক্ষার ভার তাহার উপর আছে, সেই-সব ক্লাসের ছেলেদের সে একধার হইতে ফেল করিবে।

* * * *

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন যাবৎ নির্ব্বাক্ থাকিয়া নন্দরাণীও তিনকড়ির সঙ্গে কথা কহিতে সুরু করিয়াছে। তবে সে কথা প্রায়ই এইরূপ ধরণের হয়:—

"এতই যদি ছুট্‌কীর ওপর ভালবাসা; ত তাকেই বিয়ে ক'র্‌লে পার্‌তে।"

"কোন ভালবাসাই তার ওপর নেই। তাদের ওখানে কালে-ভদ্রে আমি যাই।"

"জলজ্যান্ত সে দিন শ্যাম এসে বলে গেল যে তিনি ত প্রায়ই আমাদের ওখানে যান।"

"সংসারের অভাবের জ্বালায় আমি মরে যাচ্ছি, প্রেমের খেলা খেলবার মত মনও নেই, সময়ও নেই। তুমি বোঝ না নন্দ, না বুঝে শুধু মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মার।—ভাল কথা, তোমার হাতের ভাঙ্গা রুলী-গাছটা আমায় দিতে হবে; পয়সা-কড়ি হ'লে একেবারে নতুন করে দু'গাছা গড়িয়ে দেবো।"

"ছুটকীকে কিছু গড়িয়ে দেবে বুঝি? কি গড়াবে?"

সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দরাণীর মুখে অন্ধকার নামিয়া আসিল। তিনকড়ি মনে মনে ভাবিল,—সন্ন্যাসীই হব? তা হ'লে অভাবের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু সেটা দুর্ব্বলতা সুতরাং মহাপাপ। তার ফল আবার পরজন্মে ভোগ ক'রতে হবে। নাঃ—বীরের মত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্যই করে যাব, কণ্টককেই কণ্ঠের হার ক'রব। ভগবান্ ত অমর করে রেখে কষ্ট দিতে পারবে না। এক দিন তাঁকে মৃত্যু দিতেই হবে। পূর্ব্বজন্মে অনেক অন্যায় কায করে এজন্মে যদ্দূর ঠ'কবার ঠকছি, সুতরাং এজন্মে আর কোন এমন অন্যায় ক'রব না যাতে পরজন্মে ঠকতে হয়।

তারপর সে নন্দরাণীকে বুঝাইল, রুলীগাছটা বিক্রয় না



করিলে আর উপায় নাই। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী; তার উপর আজকালকার লোকের কাছ হইতে যেটা পাওনা, প্রায়ই সেটাতে ফাঁকি পড়িতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা চরকীর মত ঘুরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও দুটি ডালভাতের যোগাড় হইতেছে না।

তিনকড়ির এই সব কথার নিগূঢ় অর্থ হয় ত নন্দরাণী বুঝিল, নয় ত বা কিছুই বুঝিল না, নীরবে শুধুই শুনিয়া গেল।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং স্কুলে বিশেষ কোন কায কাহারই ছিল না। বেলা আড়াইটার সময় স্কুল হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি একটা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাছতলার একখানা বেঞ্চে বসিয়া এক জন যুবক একান্ত মনে কিসের ছক পূরণ করিতেছিল। পাশে গিয়া বসিয়া তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের ছক ওটা?"

"শব্দ-শৃঙ্খলের।"—বলিয়া যুবকটি ভাঁজ করিয়া পকেটের ভিতর তাহা গোপন করিল।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ওতে কিছু পাওয়া-টাওয়া যায়?"

"সমাধান ঠিক দিতে পারলেই পাওয়া যায়।"

"আপনি পেয়েছেন একবারও?"

"আমি এই প্রথম দিচ্ছি। তবে অনেকেই পেয়েছে এবং

পাচ্ছে। সম্ভবতঃ এবার আমিও পাব, কারণ আমি যা দিচ্ছি, কোন ভুল নেই বলেই ত মনে হয়।"

"ভুল না হ'লে কত টাকা পাবেন?"

"নির্ভুলে হাজার। একটা ভুল হলে সাড়ে সাতশো, দুটো হ'লে পাঁচশো, তিনটে হ'লে আড়াইশো।" বলিতে বলিতে যুবকটি উঠিয়া গেল এবং অদূরের আর একটি খালি বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পকেট হইতে তাহার ছকটি বাহির করিয়া পূরণ করিতে লাগিল।

তিনকড়ি একটা নূতন পথ পাইল। হাজার টাকা! দশশো! হাজারের তাহার দরকার নাই। পাঁচশো হইলেই সে এখন————। একটা নূতন আশা উৎসাহের ধাক্কা তাহার জীর্ণ হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিল। সে পার্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মোড়ে একটা হকার বসে। দুপুরবেলা সে বসে নাই; পাঁচটায় আসিবে। তিনকড়ির আর দেরী সহ্য হইতেছিল না। সে বরাবর হাঁটিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিল এবং এক আনা দিয়া একখানা 'মালা-গাঁথা' কিনিল।

পথে আসিতে আসিতে মোটামুটি দেখিয়া লইল, বিশেষ কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। মালীর একটু সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই মালা-গাঁথা সহজেই হইয়া যাইতে পারে। ভগবান্ কোন্ ফাঁকে

যে কাহাকে দয়া করেন! তিনকড়ি আজ নতুন উৎসাহের জোরে দ্রুতবেগে হন্ হন্ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

* * * *

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে! তিনকড়ির হুঁস নাই। সে শব্দ-শৃঙ্খলের ভিতর একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। সমাধান বাহির করিতে একেবারেই সে তন্ময়।

সর *। (লজ্জা)—এ ত নিশ্চয়ই 'সরম'

* ত। ('—' কে ছেলেরা ভয় করে)—কি হবে? কা'কে ছেলেরা ভয় করে? হয়েছে, হয়েছে! 'ভূত'—'ভূত'! —কিন্তু 'বেত' ও ত হ'তে পারে; বেতের ভয়ও ছেলেদের খুব। আচ্ছা, পরে ভাবা যাবে।

ল * স। (ওল্টালেই সোজা)—এ এ-দিকেও সোজা। মাঝখানে 'র' বসে 'লরস'; ওল্টালেই 'সরল'—অর্থাৎ সোজা।

ম *। (এই শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা, যারা মাসে মাসে বার কচ্চেন, তাঁদের উদ্দেশ্য খুব 'এই')—এটা কি হবে? তাঁদের উদ্দেশ্য—তাঁদের উদ্দেশ্য—তাঁদের উদ্দেশ্য—'মহৎ' না 'মন্দ'?—কোন্‌টা বসবে?—নিজেদের কেউ কি মন্দ বলে? সুতরাং 'মন্দ' হ'বে না, 'মহৎ'ই হবে।

* মা। (যে গৃহে এ' না থাকে, সে গৃহ গৃহই নয়।)—এটা ত—এটা ত—এটা ত—'রমা'-ই হয়। অর্থাৎ লক্ষ্মী।

যে গৃহে লক্ষ্মী না থাকে, সে গৃহ-ই নয়। 'রমা'-ই হবে। কিন্তু—কিন্তু—

তিনকড়ির মনে কথাটা ঠিক লাগিতেছে না। সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গেল। ঘরে আলো জ্বলিল। পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁক বাজিয়া উঠিল। তিনকড়ির মন শব্দ-সমাধানের অতল তলে নিমগ্ন। 'বীমা' হবে কি? জীবন বীমা? আজকাল ইনসিওরেন্সের প্রবল বন্যা। যে গৃহে কাহারো 'বীমা'—অর্থাৎ ইনসিওরেন্স করা না থাকে, সে গৃহ গৃহ-ই নয়। লক্ষ্মী বা তার পূজা-আচ্ছার বরঞ্চ কেউ আর ধার ধারে না। 'বীমা'ই হবে।

তত্রাচ মনটা সন্তুষ্ট হইল না। তিনকড়ি গভীর ভাবে চিন্তায় ডুবিয়া গেল। নন্দরাণী যখন খাইবার জন্য ডাকিল, তখন রাত দশটা। ছেলেরা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনকড়ি তাড়াতাড়ি দুটি খাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'রমা' হবে, না 'বীমা' হ'বে। ভাবনার আর বিরাম নাই, হঠাৎ তাহার মাথায় আসিল, 'বামা'। বামা অর্থাৎ স্ত্রীলোক না থাকিলে গৃহ—গৃহই নহে। 'রমা'ও যে হ'তে না পারে তা'ও নয়। তাই ত! কোন্‌টা ঠিক লাগসই? রমা, না বামা, ?—ভাবিতে ভাবিতে তিনকড়ি ঘুমাইয়া পড়িল।

*

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে। শুধু কুলুঙ্গীর ভিতর ছোট্ট টাইম্‌পীস ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া স্তব্ধ অন্ধকারকে কতকটা সজাগ করিয়া রাখিয়াছে।

হঠাৎ তিনকড়ির চীৎকারে নন্দরাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল— 'বামা, বামা, ঠিকই হবে।

শ্যামলালের স্ত্রী ছুটকার ভাল নাম বামাসুন্দরী। নন্দরাণী উঠিয়া বসিল। তিনকড়ি ঘুমন্ত অবস্থায় আবার বলিয়া উঠিল —"বামা—বামা!—যা'বার জো কি! ধরে ফেলেছি!"

রাগে, দুঃখে, জ্বালায়, নন্দরাণীর মাথাটা রি-রি করিয়া উঠিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। বড় ঘটির এক ঘটি জল আনিয়া তিনকড়ির মাথায়, মুখে, কাণে ঢালিয়া দিল। ধড়্ মড়্ করিয়া তিনকড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"এ কি করছ?"

"জল দিচ্ছি, ঠাণ্ডা হও। রাতটা কাটুক, ছুটকাকে আনতে পাঠাব এখন।" নন্দরাণী বোধ হয় আর এক ঘটি জল আনিতে উঠিয়া গেল।

তিনকড়ি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারিল না। উঠিয়া, মাথা মুখ মুছিয়া, ঘরের মেজের একধারে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল বেলা স্ত্রীর নিকট হইতে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা,

গঞ্জনা এবং উপহাস নীরবে সহ্য করিয়া তিনকড়ি অনাহারে স্কুলে আসিয়া পদার্পণ করিতেই, হেডমাষ্টার তাহার হাতে খামে-আঁটা একখানা পত্র দিলেন। তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি কিসের ?"

"পড়ে দেখুন।"

তিনকড়ি পড়িতে লাগিল। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া উঠিল। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পাশের দেয়াল ধরিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।—চিঠিখানা তাহার বরখাস্তের নোটীশ।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেক্রেটারী তথায় আসিয়া, কহিলেন—"মাইনের দিন এসে আপনার মাইনেটা নিয়ে যাবেন। কমিটীর কারো ইচ্ছে নয় আপনাকে রাখা। আপনার তিন ক্লাসের বাংলা পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, প্রায় সবই ফেল। সুতরাং কিছুই যে পড়ানো হয় না, তা বেশ বোঝা গেল। তারপর, আপনি যে-সব ক্লাসের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তারাও অধিকাংশ ফেল। অথচ তারা ভাল ছেলে, ফেল হবার মোটেই তাদের কথা নয়। এতে বোঝা যাচ্ছে, পরীক্ষা নেওটাও মনোযোগের সহিত নেন্ নি। যা' তা' করে বেগার-ঠেলা গোছের কায সেরেছেন। সুতরাং আপনাকে আর কি করে......"

তিনকড়ির আর বেশী কিছু শুনিবার দরকার ছিল না,—শুনিবার মত অবস্থাও ছিল না। সে তখনি স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মনে করিল, শশাঙ্কবাবুর বাড়ী যাই। কিন্তু তাহার মত শশাঙ্কবাবুর যে চাকুরী যায় নাই, পরক্ষণেই এ খেয়ালটা তাহার হইল। চাকুরী শুধু তাহারই গিয়াছে। সে তখন পার্কে গিয়া সেই বেঞ্চিখানার উপর সটান শুইয়া পড়িল। স্কুলের একটা মস্ত চাপ তাহার মাথা হইতে সরিয়া গিয়াছে। আজ সে কতটা হাল্কা! কতটা স্বাধীন! ঐ আকাশ, এই বাতাস এই আলো, ঐ সব গাছ-পালা, কাক-পাখী, লোক-জন—ইহারা তাহার কাছ হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছিল; আজ যেন তাহারা সব আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল। আজ তাহার সম্মুখে—বন্ধনহীন অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু পিছনে চাহিতেই তাহার এই স্বাধীনতার সমস্ত সুখ নিমিষে মিলাইয়া গেল। সেখানে একটা দুঃখের নিষ্ঠুর সংসার তাহার অন্তরের আষ্টে-পৃষ্ঠে কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া, বন্ধন-রজ্জুর একটা প্রান্ত ধরিয়া বসিয়া আছে। চাকরী থাকা সত্ত্বেও যে সংসার চলিত না, এখন কি করিয়া যে……। আর সে ভাবিতে পারে না সে মরিয়া হইয়া উঠিল। যাহা হইবার হইবে আর সে দুর্ভাবনা করিবে না। শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, হউক। দুর্ভাবনাকে সে আর কিছুতেই আমল দিবে না; ভুলিবে।—কেমন হ'ল্‌দে রংয়ের

পাখীটা ও-গাছটার ঐ ডালে এসে বসলো! ওটা কি গাছ? কাক দুটো ঝগড়া বাধিয়েছে। খুব চালক ওরা। কিন্তু কোকিল আবার ওদেরও ঠকায়। সুতরাং কাক ঠিক চালাক নয়, শয়তান। যেমন আমাদের সেক্রেটারা। নইলে গরীবের কাযটা এমনি করে…। আবার ঐ সব ভাবছি? তিনকড়ি উঠিয়া বসিল। কি বিক্রী করছ হ্যাঁ? চিনের বাদাম? এই দুপুর বেলা? না বাবা, পয়সা নেই; যাও।—আচ্ছা, পার্কের এই সব নারকোল গাছের ডাবগুলো খায় কারা? নিশ্চয়ই মালাগুলো। মালীগুলো। মনুমেণ্টটা কি উঁচু! এক দিন দেখা হয় নি।——আবার তিনকড়ি শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই বেঞ্চের উপর তিনকড়ি শুইয়া রহিল। ত লোক আসিয়াছে, গিয়াছে—সে ফিরিয়া দেখে নাই বা বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠে নাই। লোকে তাহাকে অসুস্থ মনে ভাবিয়া অন্য বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছে সন্ধ্যা হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পার্কের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াল।

সে দিন বারাকপুরে রেস্ ছিল। পথে অসংখ্য ফিরতি ট্যাক্সি-মোটর ছুটিয়া আসিতেছিল। তিনকড়ি ভাবিল, এক দিন্ পাঁচ-সাতটা টাকা নিয়ে গিয়ে রেস্ খেলতে হবে। টাকা পাওয়া যায় কোথা? সেক্রেটারী…দূর হোক! চুলোয় যাক্! 'বামা'ই হবে। 'রমা' কিছুতেই হতে পারে না। সব ঘরেই

যে লক্ষ্মী থাকবে, তা ত আর হতে পারে না। বামা সব ... থাকার কথা সুতরাং 'বামা'ই—

'আরে—আরে!—এই—এই—এই!! ভোঁক্! ভোঁক্! —ছ্‌র্‌-র্‌-র্‌—ঘ্যাঁচ্!'

যাঃ! লোকটা গেল বুঝি! একেবারে! মোটরের তলায় পিষে গেছে।

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইল।

এক জন বলিল—'একেবারে হয়ে গেছে!"

আর এক জন বলিল"—না, না শ্বাস বইছে।"

"লোকটা বিদশী বোধ হয়।"

"ঐ নোট্‌বুকটা বোধ হয় ওরই ছিট্‌কে পকেট থেকে পড়েছে। খুলে দেখুন না মশাই, নাম-টাম যদি কিছু লেখা থাকে।"

"হ্যাঁ, এই যে রয়েছে—শ্রীতিনকড়ি চক্র——"

উহার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। কিসের পর? তিনকড়ির মৃত্যুর? না। তিনকড়ির ত মৃত্যু হয় নাই। সে দিন সেই জনতার এক জন যে বলিয়াছিল, 'না না—শ্বাস বইছে' সেই ঠিকই বলিয়াছিল। তিনকড়ি মরে নাই। না-মরাটা আশ্চর্য্যের নয়। তবে এ ব্যাপারটায় আশ্চর্য্যের এইটুকু যে, মোটরের মালিক অতগুলি লোকের মধ্য হইতে আহত

তিনকড়িকে পুলিস আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। এমনকি, গাড়ীর নম্বরটা টুকিয়া লইতেও কাহারো খেয়াল বা সময় হয় নাই।

মোটরের মালিক এক জন বিশেষ ধনশালী লোক। তিনি তিনকড়িকে সে দিন বরাবর তাঁহার বালিগঞ্জের বাটীতে আনিয়া, সঙ্গে-সঙ্গেই সহরের দুই জন নাম-করা ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাত দশটার পর তিনকড়ির জ্ঞান হয়। তখন তাহার কাছ হইতে বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া সুধীরবাবু স-স্ত্রীক তথায় যান এবং নন্দরাণীকে তাঁহার বাটীতে আনয়ন করেন।

তাহার পর সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ঘরের ভিতরেই একটু-আধটু চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইতে পারে। কোথায়, কোন্ অঙ্গে, কোন্ হাড়ে আঘাত লাগিয়াছিল, সে সব আলোচনার দরকার নাই। আসল কথা —'মারে হরি ত রাখে কে; রাখে হরি ত মারে কে?' তবে তাহার একটা পায়ে আঘাতটা একটু বেশী লাগিয়াছিল। সেজন্য তাহাকে অল্প খোঁড়াইয়া চলা-ফেরা করিতে হয়। তবে ডাক্তাররা বলিতেছে, দু'এক মাস পরে এটুকু দোষ তাহার সারিয়া যাইবে। অপরাহ্ণ বেলায় তিনকড়ির ঘরে বসিয়া সুধীরবাবু প্রভৃতি এই সব আলোচনাই করিতেছিলেন।

সুধীরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল—"সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াতে বসেছিলুম। আমাকে বাঁচিয়ে, আবার সেই পথে টেনে এনে, কি ক্ষতি যে আমার করলেন, সুধীরবাবু!"

সহাস্য বদনে সুধীরবাবু বলিলেন—"কিন্তু 'বামা' কিছুতেই হ'ত না, কতকগুলো পয়সা আপনার বৃথাই যেত। তা থেকে কিন্তু বাঁচিয়েছি।"

আরও দিনকতক কাটিয়া যাইবার পর, তিনকড়ি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পায়ের দোষটাও অনেকটা কমিল। সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মনে তাহার চিরকালের চিন্তাগুলি একটির পর একটি আসিয়া জমিতে লাগিল। বাড়ীভাড়া তিন মাসের জমলো। পেসন্ন মুদীর উঠ্‌নোর দোকানে কত যে হ'য়ে আছে, তার হিসেব ত ভুলেই গেছি। কাবলী হায়দার খাঁ কত দিন হয় ত দরজায় লাঠি ঠুকে গেছে। স্কুলের আর কোন আশা-ভরসাই নেই। বাগবাজারের টুইসান্‌টা—

সুধীরবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—"কি ভাবছেন? 'বামা' হবে কি 'রমা' হবে?"

ম্লান দীপ্তিশূন্য চোখে সুধীরবাবুর দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল—"ঐ ভাবনা ভাবতে ভাবতেই ত মরণ-পথ থেকে বাঁচন-পথে গিয়ে পড়েছিলুম; আপনিই এত সব ব্যাপার

ক'রে আবার আমার চিরকালের সেই মরণ-পথে টেনে আন্‌লেন।”

“টেনে আন্‌লুম কি সাধে? আমার নিজের যে স্বার্থ রয়েছে। আমার এই কল্‌কাতার বাড়ীর কায-কর্ম্ম দেখবার শোনবার জন্যে এক জন খোঁড়া লোকের দরকার। পা-ওলা লোক রেখে দেখেছি, বাগে পেলেই টাকা-কড়ি নিয়ে পিট্‌টান দেয়। খোঁড়া হলে আর সেটি হবে না। ছুট্‌তে পার্‌বে না, সুতরাং ধরে ফেল্‌বো।”

“তা, আমাকেই বাহাল করবেন না কি?”

“বাহাল আমি সেই দিন থেকেই করেছি। তবে মাইনে বেশী দিতে পারবো না। রোজ একটি করে টাকা, অর্থাৎ মাসে ত্রিশটি টাকা; আর ফ্রী ফ্যামিলি-কোয়াটার উইথ্‌ দু'বেলের খাওয়া-দাওয়া। কেমন রাজী ত?”

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় তিনকড়ির চোখে জল ভরিয়া আসিল।

সুধীরবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“তবে ‘য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার’ আর দেবো না, তার বদলে কিছু ‘য়্যাডভান্স’ করবো। ধরুন দেখি।”

একতাড়া নোট তিনকড়ির হাতে দিয়া সুধীরবাবু কহিলেন “পাঁচশো। এটা কিন্তু আমি দান কচ্ছি না। সে পাত্রই আমি নই। এর জন্যে ফি মাসে মাইনে থেকে আট আনা করে

কেটে নেওয়া হবে। দেনাপত্তরগুলো এতে শোধ করে দিন।"

জল আর চোখে জমিয়া থাকিতে পারিল না। তিনকাড়ির দু'চোখ বাহিয়া তাহা গড়াইয়া পড়িল।

সুধীরবাবু কহিলেন—"তবে, 'বামা' যে হবেই না, এমন কথা নয়। 'বামা' 'রমা'—ও দুই-ই হ'তে পারে।"

একধারে জড়-সড় হইয়া বসিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে নন্দরাণী টিপি-টিপি হাসিতেছিল। কিন্তু চোখে তাহারও জল।

—(ঃ*ঃ)—

কপালের লেখা

গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে যেখানে খানিকটা স্থান জুড়িয়া একটা বৈঁচির ঝোপ ছিল, সেইখানে অদূরস্থ বৃহৎ ছাতিম বৃক্ষটির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। বৈঁচি-ঝোপের মধ্যস্থলে ছিল একটি খেজুরগাছ। তাহাকেই জড়াইয়া এবং ঘিরিয়া বুনো বৈঁচির ঝোপটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঝোপের গোড়ায় গোড়ায়, বৈঁচির সহিত মিতালী করিয়া, বহু বন-যুঁই চারিপার্শ্বে জড়া-জড়ি করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের অসংখ্য ফুল হইতে মৃদু সুগন্ধ বাহির হইয়া অপরাহ্নের বাতাসকে মধুর করিয়া লয়াছিল।

ঝোপের উত্তরদিক হইতে ক্ষুদ্র আঁচল ভরিয়া বন-যুঁই তুলিতে তুলিতে টুকু তাহার বিপরীত দিকে বৈঁচিফল সংগ্রহরত ভোলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

ভোলা দাদা, নাকটা খাঁদা, কপালেতে ঢোল।
পান্তা দিয়ে খাও গো দাদা তেঁতুলপাতার ঝোল॥

শ্রীমান্ ভোলা একান্ত উৎসাহের সহিত বৈঁচিফল সংগ্রহ করিতে করিতে টুকুর উদ্দেশে কহিল, তেঁতুলপাতার ঝোল তুই খেগে যা। আমি মজা ক'রে বৈঁচি খাবো। অনেক পেয়েছি। তোকে একটাও দোবো না।

টুকু কহিল, চাই না। ভারি ত বৈঁচি! আমি একটা ফুলও তোমায় কিন্তু দিচ্ছি না।

ইহারা দুইটি বালক-বালিকা। ভোলার বয়স—বছর চৌদ্দ, টুকুর বয়স—বছর দশেক। এক পাড়াতেই দুই জনের বাড়ী। এক সঙ্গেই প্রায় দু'জনে খেলা করে, গল্প করে, বেড়ায়।

ও-গাঁয়ের তালগাছগুলার অন্তরালে যখন সূর্য্য অস্ত গেল, তখন দু'জনে মাঠ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। একের আঁচলে বৈঁচি ফল, অপরের বন-যূঁই।

গাঁয়ে ঢুকিবার মুখে বহুদিনের এক শিবের মন্দির ছিল। তাহার চারিদিকই ভাঙ্গা-চোরা। পথের দিকের দেয়ালটি সম্পূর্ণ ভাবেই পথের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, সেই স্থানের কাঁচা পথটিকে পাকায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। মন্দিরটির অবস্থা শোচনীয় হইলেও, তাহার অধিকারী দেবতাটি, তাঁহার দেবত্ব-বলে এখনো বজায় আছেন। তাঁহার দৈনিক সেবা ও সেবক ঠিকই বাঁধা আছে এবং সেবকটি দিনের কোন-না-কোন সময়ে মন্দির মধ্যে একবার হাজিরা দিয়া যান। সেই মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া

ভোলা কহিল, আমি মন্দিরের রোয়াকে বসে বৈঁচির এক ছড়া মালা গাঁথি। বলিয়া সে ছুটিয়া মন্দিরের রোয়াকের উপর উঠিল। —বন-যূঁইগুলো দিয়ে আমিও এক ছড়া গাঁথি, বলিয়া টুকুও ভোলার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর উভয়ে অদ্ভুত উপায়ে, পরিহিত বস্ত্রের পাড় হইতে চারি খেই করিয়া সুতা বাহির করিয়া লইল। তারপর সম্মুখস্থ একটা চারা বাবলা গাছ হইতে, উভয়েই দুই চারিটা করিয়া কাঁটা ভাঙ্গিয়া আনিয়া তদ্দারা মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল।

মালা গাঁথা হইলে, ভোলা তাহা হইতে একটা একটা বৈঁচি ছিঁড়িয়া লইয়া খাইতে সুরু করিয়া দিল। পাকা বৈঁচি, একটু টানিলেই সুতা হইতে খসিয়া আসে। টুকু কহিল, আমায় গোটাকতক দাও না, ভোলা-দা, খাই। দাঁড়া—দিচ্ছি, বলিয়া আরও গোটাকতক খাইয়া, অবশিষ্ট মালা-ছড়া ভোলা গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, এই নে।

টুকু তাহার ফুলের মালাটা গলা হইতে খুলিয়া ভোলার গলায় পরাইয়া কহিল, তোমায় দিয়ে দিলুম, ভোলা-দা। তারপর যাহার গৃহে গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

টুকুর মা কহিল, হ্যাঁলা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

এই দেখ না—কি এনেছি। বলিয়া টুকু হাত দিয়া তাহার গলার বৈঁচির মালাছড়াটা দেখাইল।

সুরবালা অর্থাৎ টুকুর মা কহিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠের ধারে বসে বসে বুঝি ওই হচ্ছিল? কার সঙ্গে গিয়েছিলি?

ভোলা-দার সঙ্গে। বৈঁচি আমি তুলিনি, মা। আমি অনেক বন-যূঁই তুলেছিলুম। এ ত ভোলা-দার মালা। ভোলা-দা আমায় দিয়ে দিলে। আমি আমার ফুলের মালা-ছড়া তার গলায় পরিয়ে দিয়েছি।

বৃন্দাবন অর্থাৎ টুকুর বাবা ঘরের মধ্যে ছিল। স্ত্রী কন্যার প্রশ্নোত্তর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, তা হলে ত ভালই হয়েছে রে, টুকু। ভোলার সঙ্গে যখন মালা-বদল ক'রে এসেছিস, তখন ওর সঙ্গেই তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে।

ফোঁস্ করিয়া সুরবালা বলিল, দেখ, মেয়েকে নিয়ে ও রকম যা-তা বাজে ঠাট্টা করো না।

কথাটা যদিও হাল্কা ভাবেই বৃন্দাবন বলিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর অনুযোগ তাহাকে একটু ভারি করিয়া তুলিল। কহিল, বাজে ঠাট্টা আবার কি! ভোলার সঙ্গে মনে কর ভবিষ্যতে যদি ওর বিয়েই হয়—

একটা অশ্রদ্ধাসূচক হাসির ভঙ্গিতে সুরবালা কহিল, গলায় দড়ি! ভোলার সঙ্গে টুকুর বিয়ে! কি যে বল তার ঠিক নেই।

মন্দটা আর কি বল্লুম।

একটা ঝাঁকি দিয়া সুরবালা মুখখানাকে ঘুরাইয়া বলিল, থামো—থামো, মিছে বকো না।

যদিও টুকুর এখনি বিবাহের কোনই সম্ভাবনা নেই, যেহেতু তাহার বয়স এক্ষণে বছর দশেক মাত্র, কিন্তু তাহার জন্য পাত্র হিসাবে ভোলাকে সুরবালার অপছন্দ এবং বৃন্দাবনের পছন্দ হওয়ার মধ্যে যে গুহ্য হেতুটি বর্ত্তমান, তাহার একটু আভাস দিলে, এ বিষয়ের অন্ধকারটা একটু কাটিয়া যাইবে।

বৃন্দাবন পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়াছে, পাড়াগাঁয়ে মানুষ হইয়াছে। সে গ্রামের সহজ-সরল জীবনযাত্রা পছন্দ করে। গ্রাম্যজীবনের মধ্যে যে অনাড়ম্বর সুখ ও আনন্দ নিহিত আছে, সে তাহারই প্রিয়। অবশ্য ভোলার সহিত টুকুর বিবাহের কথা কোনদিনই সে ভাবে নাই। তাহা সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার চিন্তামাত্রও কোনদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই। তবে ভোলাকে এই জন্য তাহার পছন্দ যে, ভোলা গ্রামের ছেলে। তাহার শরীরটা শক্তিশালী। কোথাও চড় খাইয়া মলিন মুখে অক্ষমতাকে পুঁজি করিয়া চলিয়া আসিবার মত ছেলে সে নয়। অথচ সে বিনীত এবং ভদ্র। তাহাদের বিষয়-আশয়ও যথেষ্ট। বাড়ী, ঘর, পুকুর, বাগান, জমী-জমা যথেষ্ট আছে। ভোলা শিক্ষার উচ্চতম ধাপে যদিও না উঠে, তাহা হইলেও তাহাকে মূর্খ বলা চলিবে না। আজকালকার কলেজে-পড়া ছেলেদের মত

অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি তাহার না ঘটিলেও, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি যে তাহার থাকিবে, তাহা এখনই তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এই সব কারণে, বৃন্দাবন 'দেশী-প্যাটার্ণে' প্রস্তুত ভোলাকে পছন্দ করে। আর সুরবালা ঠিক তাহার বিপরীত। সে চায়, মেয়ে লেখা-পড়া শিখিবে, গান-বাজনা শিখিবে, উচ্চ শিক্ষিত বিলাত-ফেরত জামাই হইবে, 'লেকে'র কাছে বা বালীগঞ্জে বা 'সাউথ-এণ্ড পার্কে' বাড়ী হইবে, মোটর থাকিবে, মোটরে বেড়াইবে, পিয়ানো বাজাইবে—ইত্যাদি—ইত্যাদি। কোথায় তাহার কল্পনা, আর কোথায়—ভোলা! ভোলার চেহারাটা পর্য্যন্ত কুৎসিৎ। তালগাছের মত লম্বা, ষণ্ডা-গুণ্ডার মত চেহারা, নাকটা খাঁদা, কপালের উপর মস্ত একটা টোল্। সুতরাং এই খাঁটী স্বদেশী 'প্যাটার্ণ' কি করিয়া তাহার পছন্দ হইবে? তাহার পছন্দ—বিলাতী 'প্যাটার্ণের' ছেলে।

যাহা হউক, এই সূত্রেই সেদিন রাত্রে আহারাদির পর সুরবালা স্বামীর নিকট পুরাতন কথাটার পুনরুত্থাপন করিয়া কহিল, আর দেরী কোরো না। শীগ্গির একটা ব্যবস্থা কর। মেয়ে আমার এই হতচ্ছাড়া পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে জংলী হয়ে গেল। আর এই জঙ্গলদেশে আমার দেহটাও গেল। এখানে আর আমি কিছুতেই টেঁকতে পারব না।

অর্থাৎ সুরবালা দেশের এই বাড়ীতে আর থাকিতে নারাজ। এখানে বাঁধানো পথ-ঘাট নেই, পুকুরের জলে নাইতে হয়। রাত্রে 'হেরিকেন' জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। বিশেষতঃ, টুকুকে আর হাই-স্কুলে না দিলেই নয়। এখানকার লক্ষ্মীছাড়া 'বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ে' কি ছাই আর হবে! সুতরাং শীঘ্রই এখানকার বাস উঠাইয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে।

কথাটা বহুদিন হইতেই হইতেছে। প্রথম প্রথম বৃন্দাবন ততটা গা করে নাই। কারণ, দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিলে তাহার 'যত্র আয়, তত্র ব্যয়' হইবে। একটি পয়সা আর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইবে না। সে 'কারবারী' লোক। তাহার বাঁধা-ধরা কোন চাকুরী নাই, বাঁধা-ধরা কোন মাহিনাও নাই। আজ যেন তাহার কারবার চলিতেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে দৈবদুর্বিপাকে এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন তাহার এত বড় কারবার হয় ত একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ভগবান্ না করুন, যদি ভবিষ্যতে তেমন দিন আসে, তাহা হইলে তাহার সঞ্চিত অর্থের সুদ হইতেই গ্রামের এই অনাড়ম্বর সংসারযাত্রা অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া বাস করিলে সে অবস্থায় তাহা হইবে না। মাসিক একশত টাকায় দেশে তাহার যে সংসার চলিতেছে, কলিকাতায় গিয়া থাকিলে সে স্থলে তাহার

পাঁচশত টাকা করিয়া যে খরচ হইবে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। এই সব ভাবিয়া, সে ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় বাসের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু ইদানীং সুরবালার পীড়াপীড়িতে তাহাকে সুরবালার সুরে সুর মিশাইতে হইয়াছে। কথা হইয়াছে, এই আষাঢ়েই তাহারা রতনপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিবে। তাই স্ত্রীর কথায় বৃন্দাবন উত্তর দিল, এই ত সবে চৈত্র মাস। এ মাস কাটুক, তারপর বোশেখ জৈষ্ঠ কাটুক, আষাঢ়ের গোড়াতেই ত আমাদেব যাওয়া স্থির। সব ত বন্দোবস্ত হয়েই আছে।

সুরবালা আর কোন কথা কহিল না।

তারপর চৈত্র মাস কাটিয়া, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। আষাঢ় মাসের প্রথমেই স-স্ত্রীক, স-কন্যা বৃন্দাবন কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

আসিবার দিন গরুর গাড়ীতে করিয়া ষ্টেশনের পথে তাহারা দেখিল, ভোলা—তাহাদের নদীর ধারের 'আঠার বিঘা'র বাগান হইতে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল ঘাড়ে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সুরবালা কহিল, কি যাচ্ছেতাই—ছেলেটা! দুনিয়ার কুচ্ছিত! যেন একটা পাহাড়ী গুণ্ডো!

টুকু ছই'য়ের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—ও ভোলা-দা!

সুরবালা তাহার মুখখানাকে ভিতরের দিকে টানিয়া আনিয়া ধমকাইয়া উঠিল, চুপ্ কর্—পোড়ার মুখো মেয়ে !

২

যে আষাঢ়ে বৃন্দাবন স্ব-গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার পর চৌদ্দটি আষাঢ় আসিয়াছে এবং গিয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের গ্রামত্যাগের দিন যদি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সুরু হইত, তাহা হইলে এই সময়টাতে তাঁহার অযোধ্যায় ফিরিবার কথা।

সুতরাং যে যুবতীটি অপূর্ব্ব লীলায়, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায়, সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একান্ত মনে পিয়ানো বাজাইতেছিল, সে আর এক্ষণে দশমবর্ষীয়া বালিকা নহে। চতুর্বিংশ বর্ষীয়ার পূর্ণ যৌবন-শ্রী তাহার দেহে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার বাপ-মাই শুধু বুঝিতে পারে যে, তাহাদের সেদিনকার সেই 'টুকু' আর আজিকার এই শ্রীমতী আইভিলতা—একই মেয়ে ; কিন্তু অপরের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে।

আইভির পায়ে ব্লু-মথ্ মল্‌মণ্ডিত একজোড়া 'স্যাণ্ডেল,'; পরণে ঐ রঙ্গেরই একখানি সাটিনের সাড়ী ; গায়ে অপেক্ষাকৃত ফিকে

নীল রংয়ের একটা ব্লাউস্। অবাধ্য লঘু কেশগুচ্ছ এলো-খোঁপায় আবদ্ধ থাকিলেও, কতক কতক তাহার কপালে, কপোলে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ঢুলিতেছিল। কাণে নীল-পাথরের দুইটি ক্ষুদ্র দুল চিক্ চিক্ করিতেছিল। গলায় একগাছি সরু মব্-চেন। হাতে তিন গাছা করিয়া ভাটিয়া চুড়ি।

এই বছরেই কুমারী আইভি এম,এ,-পাশ করিয়াছে। পরীক্ষার উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রম তাহার শেষ হইয়াছে। তাই চিন্তাশূন্য পরিতৃপ্ত অন্তরে, সে এখন ফুল্ল প্রজাপতির মত হাসিয়া, খেলিয়া, গাহিয়া, দিন কাটাইতেছে।

পিয়ানোর সুরের সঙ্গে সে নিজ কণ্ঠের মৃদু মধুর সুর মিশাইয়া গাহিল—

আজি সন্ধ্যায় তুমি আসিয়া দাঁড়াও
আমার—মন-ভোলান বেশে।

একটি দীর্ঘায়তন যুবক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, ভাল আছ ?

আইভি গান বন্ধ করিয়া অপরিচিত আগন্তুকের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার প্রশ্নের কোন উত্তরই দিল না। ভাবিল, কে এ ? এ কি সেই রতনপুরের···

পিছন হইতে সুরবালা প্রবেশ করিয়া কহিল, চিনতে পারিস নি বুঝি ? রতনপুরের ভোলা রে!

আইভি তখন অস্বাভাবিক হাসিমুখে ভোলানাথের দিকে চাহিয়া কহিল, ওঃ!—বসুন। ভাল আছেন ?

সুরবালা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে, বাবা মা তোর ভাল আছে ত?

বাবা ত আজ বছর আষ্টেক হল মারা গিয়েছেন।

চম্‌কাইয়া উঠিয়া সুরবালা কহিল, মারা গেছেন! তা হ'লে তোর ঘাড়েই এখন সংসার? তা মা ভাল আছে ত ?

হ্যাঁ।

বিয়ে-থা কিছু করেছিস, না বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াচ্ছিস্ ?

হাসিতে হাসিতে ভোলানাথ কহিল, বাউণ্ডুলে হয়েই বেড়াচ্ছি। আপনারা ত দেশ একেবারেই ত্যাগ করলেন। সেই যে এলেন, আর ত গেলেনই না। দেশকে কি করিছি, তা ত আর দেখলেন না ?

ও পাড়াগাঁয়ে কি আমাদের থাকা পোষায়? এই আইভি এবার এম,এ, পাশ করেছে। এইবার ওর বিয়ে দিতে হবে। হয় ত বিলেত ফেরৎ ম্যাজিষ্ট্রেট,, কি ডাক্তার,কি কোন ব্যারিষ্টার জামাই হবে। সে কি আর ঐ জঙ্গলদেশে যেতে রাজী হবে ? বুঝলি না? ওসব জায়গায় তোদের থাকা চলে, আমাদের চলে না।

উভয়ের কথার ফাঁকে, আইভি ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

ভোলানাথ সুরবালার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কাকা-বাবু?

তিনি গেছেন—ঐ খবরের কাগজের আফিসে। ওই ওর একটা বিয়ের চেষ্টা করতে হবে ত এইবার। তাই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে গেছেন। তা তুই বাড়ী চিনে এলি কি করে?

গাঁয়ের কার মুখে যেন শুনেছিলুম যে, আপনারা বৌবাজারে হিদারাম মুকুয্যের—

মুকুয্যে নয়—বাঁড়ুয্যে।

হ্যাঁ—তা অনেক খুঁজে খুঁজে এসেছি, খুড়ীমা। আমি ত কোলকাতায় বড় একটা আসি নি। দু'বার খালি একজামিন্ দিতে যা—

বৃন্দাবন এই সময়ে প্রবেশ করিয়া ভোলাকে দেখিয়া চম্-কাইয়া উঠিয়া কহিল, আরে কে রে—আমাদের ভোলা না? তুই এই এত বড় হয়েছিস! ওঃ! চোদ্দ বছর পরে তোকে দেখলুম। সব ভাল আছিস্ ত?—থাক্ থাক্, আর পায়ের ধূলো নিতে হবে-না।

সুরবালা বৃন্দাবনকে ইসারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া লইয়া

গেল। চুপি চুপি কহিল, ওকে এ-ঘর থেকে নিয়ে তুমি অন্য ঘরে গিয়ে বোসো। সাতটায় আইভির বন্ধু-বান্ধবরা সব এসে পড়বে। এই ঘরে ব'সে সব চা-টা খাবে।

বৃন্দাবন কহিল, তা ভোলা একধারে বসে থাকলেই বা।

কি যে তুমি বল, তার ঠিক নেই। তাদের মধ্যে ও ব'সে থাকবে!

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। ভোলার উদ্দেশে কহিল, দেখ্ ভোলা, আজকে আইভির—

আচ্ছা কাকাবাবু, টুকুর ভাল নাম ত আনন্দময়ী, তা—

তা—হ্যাঁ—তা ছিল বটে। জন্মরাশি হিসেবে "আ" অক্ষর দিয়ে ওর নাম রাখবার কথা কি না। তাই আমি 'আনন্দময়ী' রেখেছিলুম। তা ঐ আনন্দময়ীই বরাবর ছিল। এখানে এসে হাইস্কুলে যখন ভর্ত্তি হোল, তখন ও এবং ওর গর্ভধারিণীর, অর্থাৎ তোমার কাকীমার, সাবেক ঐ নামটা অত্যন্ত অপছন্দ হয়ে উঠ্‌লো। সেই জন্যে ওরা নামটা পাল্‌টে—; তা আমি বলেছিলুম, আনন্দময়ী অপছন্দ হয়ে থাকে, 'আ' দিয়ে ত আরো নাম হতে পারে—আশালতা, আভাময়ী, আপদনাশিনী, আমোদিনী।—সহসা তটিনীর মত কলধ্বনি করিতে করিতে আইভির বন্ধু-বান্ধবের দল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বৃন্দাবন কহিল, আয়, ভোলা, আমরা ও-ঘরে নিরিবিলি ব'সে রতনপুরের দুটো কথা-টথা কই গে।

বৃন্দাবনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোলানাথ বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক ধরিয়া ও-ঘরে উভয়ের আলাপ চলিবার পর, বৃন্দাবন দুঃখের সহিত বলিল, তাই ত রে, বাবা তোর মরে গেলেন! গাঁয়ের মধ্যে তোদেরি ত জমী-জমা সব চেয়ে বেশী। কত বিঘে হবে ভোলানাথ?

শ' পাঁচেক বিঘে হবে।

তা, আই.এ. পাশ ক'রে আর পড়লি না কেন,—হ্যাঁ রে?

নাঃ! ও সব আমার ধাতে সয় না।—কাকাবাবু, একটা ক্লাব বসিয়েছি গাঁয়ে।

কিসের ক্লাব বসালি?

'পল্লীমাতা ক্লাব'। লাইব্রেরী, লাঠিখেলা, কুস্তী, চেরিটেবল্ ডিস্পেনসারী, হরিসভা, রাস্তা-ঘাট, টিউব-ওয়েল, মেয়ে-স্কুল, গো-চারণের মাঠ—কত কি করেছি, কাকাবাবু। সে রতনপুর আর নেই। প্রায় হাজার বিশ টাকা গাঁয়ে ঢেলেছি। এখনো অনেক কিছু বাকী।

ভালই করেছিস। বেশ বেশ। তোর এই খদ্দরের জামা-কাপড় দেখে আমিও ঐ রকম কিছু আঁচ কচ্ছিলুম। তা হ্যাঁরে, মোড়লদের খবর কি? সব ভাল আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওদের ন্যোনতা বিল'টা গেল-বছর আমি কিনে নিয়েছি, কাকাবাবু। সাড়ে সাত হাজার দাম হল। তা, গেল-

বছরেই প্রায় শ’ পাঁচেক টাকার মাছ বেচেছি। ও সাত হাজার টাকা আমি সাত বছরেই তুলে নেবো।

প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া বৃন্দাবন বলিল, বটে! বেশ বেশ বেশ! তা, হাঁরে ভোলানাথ, বিয়ে-থা কিছু করলি না কেন?

গাঁয়ের ঐ সব কাজের জন্যে ফুরসৎ পাইনি, কাকাবাবু। বিয়ে আর করব না ভাবছি। কিন্তু মা ভারি এইবার পেড়াপিড়ি সুরু করেছেন। দেখি, যা হয় হবে।

এই সময়ে ও-ঘর হইতে আইভির মধুর কণ্ঠের গান এ-ঘরে শুনিতে পাওয়া গেল—

আজি সন্ধ্যায় তুমি আসিয়া দাঁড়াও
আমার মন-ভুলানো বেশে।
সাঁজের তারকা ঐ দেখ বঁধু
উঠেছে আকাশে হেসে।

ভোলানাথ গান শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, সেই টুকু! সেই একদিন—আর এই একদিন। একদিন রতনপুরের পথ-ঘাট-মাঠ দু’জনে একসঙ্গে বেড়াতে আর বাকী রাখি নি। সারা সকাল-বিকেল-দুপুর দু’জনে রতনপুর চষে বেড়াতুম। সকাল বেলায় দু’জনে আড়ি হয়েছে, আবার বিকেলেই ‘ডাব্ ডাব্ ডাব্, তোর সঙ্গে জন্মের ভাব’ বোলে ভাব হয়েছে। কত ফুল ছেঁড়া, কত ফল পাড়া, কত মাছ ধরা, বিলে-পুকুরে

কত সাঁতার কাটা, কত ছোটাছুটি, দৌড়াদোড়ি, 'টু' দিয়ে 'আঠারো বিঘে'র বাগানে কত লুকোচুরী খেলা—উঃ! আজ সে সে-সব কথা মনেই করে না। আজ ভাল ক'রে একটা কথাও সে বল্‌লে না। ভাল ক'রে আমার দিকে চেয়েও দেখলে না। শুধু একটুখানি 'বসুন, ভাল আছেন?'—এইটুকুতেই তার আলাপের শেষ হয়ে গেল!

ভোলানাথ মনে করিয়া আসিয়াছিল, আজ রাত্তিরটা সে এইখানেই থাকিবে। চৌদ্দ বৎসর পরে টুকুর সঙ্গে দেখা, কত গল্প, কত কথাই হইবে। কিন্তু তাহার আঘাত-প্রাপ্ত মন কিছু-তেই আর এ স্থানে থাকিতে চাহিল না। আর কিছুক্ষণ বৃন্দা-বনের সঙ্গে কথা কহিয়া, সে বিশেষ-কোন আবশ্যক কাজের অছিলা দেখাইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ও-ঘরের দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিল না।

৩

দৈনিক সংবাদপত্রে বৃন্দাবন আইভির বিবাহের জন্য নিম্নরূপ বিজ্ঞাপনটি সে-দিন দিয়া আসিয়াছিল—

একটি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সুস্থকায়, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা

পাত্রীর জন্য একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পাত্র আবশ্যক। পাত্রী এম. এ. পাশ এবং সর্ব্ববিধ গৃহ-কর্ম্ম, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিতে নিপুণা। সম্ভবমত যৌতুকাদি দেওয়া হইবে। পাত্রীর বয়স ২৪। পাত্র বিলাত-ফেরত হইলে ভাল হয়। আবশ্যক হইলে, পাত্রীর ফটো দেওয়া এবং পাত্রের ফটো চাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই দিন পরেই, 'বউনি' স্বরূপ প্রথম যে পত্রখানি আসিল, তাহার মর্ম্ম এই—

আমি ১৯২৯ সালে প্রথম 'ডিবিজনে' আই-এ পাশ করিয়াছি ... কলেজ হইতে এতদুদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত 'গিরিজাসুন্দরী পদক'টি আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার বয়স বর্ত্তমানে ৩০। যৌতুকের পরিমাণ, পিতার পেশা এবং পাত্রীর আর ভাইভগ্নী আছে কি না, সেই সংবাদ সহ পাত্রীর ফটো পাঠাইলে সুখী হইব।

সুরবালা কহিল, কি আস্পর্দ্ধা! লোকটা কোথাকার!

বৃন্দাবন দ্রুতভাবে কহিল, কেন কেন কেন?

সুরবালা কোন উত্তর না দিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বৃন্দাবন কহিল, তাইত! 'বউনি'তেই এমন ধারাটা হ'ল!

সুরবালা কোন কথা না বলিয়া, মুখখানা ভার করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায় প্রত্যহই দু'একখানি করিয়া পত্র আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে আরও একখানির মর্ম্ম এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহা এই—

মহাশয়,

আমি একজন গ্রাজুয়েট। যদিও 'পাশে'র হিসাবে আমি একজন বি.এ. কিন্তু আমি অনায়াসে এম. এ. ছাত্রকে পড়াইতে পারি। আমার অধ্যাপকবর্গ এতৎ সম্পর্কে যে সকল 'টেষ্টিমোনিয়াল্' দিয়াছিলেন, আবশ্যক হইলে তাহার কপি পাঠাইতে পারি। ইউনিভার্সিটীর সার্টিফিকেট হিসাবে আমার বর্ত্তমান বয়স ৪০ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ২৫ বৎসরের যুবকের মত আমার উদ্যম এবং বল। আমি 'হাই-জাম্পে' এবং 'লং-জাম্পে' এখনো যুবকগণের মধ্যে প্রথম হইতে পারি। এতৎসহ 'পোষ্টেজ' পাঠানো হইল। ত্বরায় মতামত জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীযুক্ত হাই-জাম্প 'পুনশ্চ' লিখিয়াছেন—

আমার অন্যত্র হইতে বহু 'সন্ধান' আসিতেছে সুতরাং পত্রপাঠ আপনাদের মতামত জানাইলে ভাল হয়। ফরিদপুর জেলায় খাজুরতলা গ্রামে আমার ১০ বিঘা ধান্যজমি, বাগান বাগিচা এবং পাঁচ কামরা ঘর সহ নিজের ভিটা-বাটী আছে।

পত্রখানা পড়িয়া সুরবালা হাসিয়া ফেলিল। বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে এইটিই বোধ হয় তোমার মনোমত হ'ল ?

হুঁ, হ'ল। বলিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া পিণ্ড পাকাইয়া জানালা দিয়া সুরবালা তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিল। কহিল, লোকটাকে দেখছি 'চাল্লিশে'তেই পেয়েছে !

যাহা হউক, এইসব অ-পাত্রদের পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একদিন একটি যথার্থ পাত্রের সন্ধান মিলিল। ছেলেটি সর্ব্বাংশেই ভাল। বি. এ. পাশ, বয়স তিরিশের মধ্যেই। বাপ রিটায়ার্ড সাব্-জজ্, কলিকাতায় বালীগঞ্জ য়্যাভিনিউয়ের উপর প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটো দেখিলে ছেলেটিকে অতিশয় সুশ্রী বলিয়াই মনে হয়। এই ছেলেটিকে, সম্পূর্ণ না হইলেও, সুরবালার কতক পছন্দ হইল। ছেলেটির দেহের গঠন এবং মুখাবয়ব সম্বন্ধে সুরবালা কহিল, বড় চমৎকার! চোখ দুটি কী সুন্দর দেখেছ ? আইভির পাশে এই ছেলেটিই বেশ মানানসই হবে। তবে—

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, আবার তবে কেন ?

সে কিছু নয়। তা হ'লে একদিন ছেলেটিকে গিয়ে তুমি দেখে এস।

সুতরাং দু'একদিন পরে বৃন্দাবন ছেলেটিকে দেখিয়া আসিল।

সবই ঠিক বটে, কিন্তু ছেলেটির গায়ের রং কালো। ফটোতে কিন্তু খুব ধব্‌ধবে ফর্সা বলিয়া মনে হইয়াছিল। সুতরাং সুরবালা বাঁকিয়া বসিল। বৃন্দাবনের সহিত সুরবালার খিটিমিটি বাঁধিল। বৃন্দাবন বলে, সব দিক্ দিয়ে পছন্দমত মিলবে না। সুরবালা বলে, মিলতেই হবে। না মিললে আমি মেয়ের বিয়ে দেবই না। বৃন্দাবন রাগ করিয়া বলে, সেই সব চেয়ে ভাল। তা হ'লে আমিও বাঁচি।

তখন শুধু বিজ্ঞাপনে কুলাইল না। সুরবালার তাগিদে বৃন্দাবন দু'এক জন ঘটক লাগাইল। ঘটকরা নানা স্থান হইতে নানা পাত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল। কিন্তু সুরবালার সব দিক্ দিয়া পছন্দ কোনটাই হয় না। হয়, বয়সের দিক্ দিয়া, নয় চেহারার দিক্ দিয়া, নয় ত বা লেখাপড়ার দিক্ দিয়া, কোন-না-কোন বাধা আসিয়া দেখা দেয়। আবার কোন ক্ষেত্রে যদি এসব বাধা না থাকে ত, হয় ছেলেটি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, নয় ত বা যৌতুকের টাকার পরিমাণ লইয়া গোল বাধে।

এমনি করিয়া ছয় মাস কাটিবার পর, ভবানীপুরের একটি উকীলের ছেলের সন্ধান পাওয়া গেল। ছেলেটি এম. এ.। স্বভাব-চরিত্র এবং চেহারা সবই ভাল। খাঁইও বিশেষ কিছু নাই। এইখানেই এতদিন পরে সুরবালা মত করিল। বৃন্দাবন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কন্যার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—এই

পরিচয় দিয়া একদিন সুরবালাও তাহার হবু-জামাতাটিকে দেখিয়া আসিল। দেখিয়া আসিয়া তাহার পছন্দ আরও পাকা হইল। এইখানেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। 'পাকা' দেখিবার একটা দিন বাছিয়া ধার্য্য করা হইল। বরপক্ষীয়রা ঐ দিন ষোল জন আসিবেন। বৃন্দাবন মনে মনে হিসাব করিল, এদিক্ থেকেও জন-কয়েক হইবে। অর্থাৎ একশতটি টাকা ঐ দিনের প্রীতি-ভোজে ব্যয় হইবে।

কিন্তু—কিন্তু—হইল না। সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হঠাৎ একদিন সুরবালা বৃন্দাবনকে বলিল, দেখ, এখানে আইভির বিয়ে দেব না।

বিস্মিত হইয়া বৃন্দাবন কহিল, কেন?

সুরবালা কোন উত্তর দিল না। শুধু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটানা ঘাড় নাড়িয়া যাইতে লাগিল।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া কহিল, ব্যাপারটা কি খুলেই বল।

ব্যাপার আর কি। আইভি এম. এ. পাশ, ছেলেটি ত তার ওপর নয়; সে-ও ঐ এম. এ.। এরও যা দর, ওরও সেই দর। মেয়ের চেয়ে ছেলে একটু ওপর না হ'লে কি মানায়?

নিশ্চয়ই নয়। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' তাই ত গোড়াতেই বলেছিলুম, ওগো, মেয়েকে অত লেখাপড়া শিখিও না, এর পর পাত্র মেলা দায় হবে। তা, সে সব কথা ত আর

কাণে তুল্‌লে না। একেবারে মেয়েটিকে সব দিক্ দিয়ে মেম ক'রে তুল্‌লে।

আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ কর।

চুপ করেই ত আছি, আর থাকতেও হবে। তবু, ছু'একটা কথা বলে নি। মেয়ের চেয়ে ছেলে একটু ওপরে না হ'লে যে চলবে না, এই যে কথাটা বলেছ, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। নইলে, যে দিনকাল পড়েছে, স্বামী বেচারা স্ত্রীটিকে কিছুতেই 'ম্যানেজ' করতে পারবে না।

কথাগুলা অপ্রীতিকর হওয়াতে, সুরবালা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বৃন্দাবনও ছাড়িল না। আহার অনুসরণ করিতে করিতে কহিল, তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমিও ম্যাট্রিক পাশ, তুমিও ম্যাট্রিক পাশ। তার ফলে কি বিষম দাবিয়ে তুমি আমায় রেখেছ! সব তা'তেই খোঁটা দাও, 'বিছে আমারও যা—তোমারও তা।' কোন কাজে তাই একটা কথা পর্য্যন্ত আমায় আর কইতে দাও না। তুমি হলে 'সুরবালা'; সুরলোকেই তোমার শোভা পায়। তা না হ'য়ে———

বিষম বিরক্তির সহিত মুখ ঝাম্‌টা দিয়া সুরবালা কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যাও!

যাব আর কোথায়? এম. এ.র সঙ্গে কি আর এম. এ. চলে? খোঁথ আবার খুঁজে পেতে, এক্স, ওয়াই, জেড্, পাশ

করা কোথাও কাজে নাই কি না। বলিয়া বৃন্দাবন চলিয়া আসিল।

৪

আইভির বিবাহ—বিষম একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন ঘটকদের গোপনে কহিল, একটু খেটে-খুটে ভাল দেখে একজন মিলিয়ে দাও, ঘটকালী যা দেবো বলিছি, তার ডবল দেবো। আর যে দেরী করাও চলে না।

ঘটকরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল।

সুরবালা তাহাদের ডাকিয়া গোপনে বলিল, আমি আলাদা বক্‌সিস্ দেবো, একজন বিলেত-ফেরত হ'লেই ভাল হয়।

বিলাত-ফেরত একটি পাত্রেরই সন্ধান আনিয়া ফেলিল উহাদেরই একজন। ছেলেটি এক বছর সাড়ে পাঁচ মাস কোন ইলেক্‌ট্রাক্যাল কলেজে সেখানে পড়িয়া আসিয়াছিল। 'মিষ্টার গোংলী' দেখিতে শুনিতেও যেমন চোস্ত, সাহেবী আদব-কায়দাতেও তেমনি চোস্ত। পিতা দিগম্বর গাঙুলীর ত্রিজ্ঞি একমাত্র সন্তান। গাঙুলী মশাই আদালতে পেস্কারী করেন। যে ঘটক 'সম্বন্ধ' আনিয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়া একদিন আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে বৃন্দাবন এই পাত্রটিকে দেখিতে গেল।

'লেকে'র কাছে পি ৪৯ নং বিদ্যাসুন্দর রোডে তাঁহাদের বাড়ী। বাড়ীখানি ছোট খাটো একতালা। দূর হইতে ঘটক দেখাইল, ঐ যে ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া যে যুবকটি, ওইটিই পাত্র। বৃন্দাবন দেখিল, ছেলেটি ঢিলা 'শ্লিপিং সুট' পরিয়া পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখে একটা মোটা ইজিপসিয়ান সিগারেট। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একজনের ডাকে উভয়েই ফিরিয়া দাঁড়াইল। লোকটি কহিলেন, চলুন, চলুন, দাঁড়াবেন না। আমি দোকানে এক পয়সার পাণ কিনতে গিছলুম।—সেই অষ্ট-হস্ত পরিমিত লালপাড় সাড়ী-পরিহিত, নগ্ন-গাত্র, খর্ব্ব বিলাত-ফেরত পাত্রের পিতাটিকে বৃন্দাবন যখন একটু মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল, তখন ঘটক বলিল, বৃন্দাবন বাবু, ইঁনিই দিগম্বর বাবু,—ভারি মহাশয় লোক। ভারি দরাজ............

দিন-দুপুরে জাগ্রত অবস্থায় শ্লিপিংসুট-পরিহিত পাত্রটিকে দেখিবার সময় বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজীর বিলাতে কতদূর পড়াশুনো হয়েছে?

বাবাজী কহিলেন—তাহার মুখের সেই মোটা সিগারেটটা তখন দুই আঙ্গুলের ফাঁকে স্থান পাইয়াছে—আই হ্যাভ্ বিন্ এডুকেটেড্ ইন্ দি সেফিল্ড ইলেকট্রীক্যাল্ সিনডিকেট্ এণ্ড কলেজ।

তা হ'লে, সেখানে পাশ করেছ ত ?

আই হ্যাভ্ ফিনিস্ড মাই খোর্স দেয়ার।

দিগম্বর বাবু কহিলেন, বিলেত থেকে ফিরে এসে, বাঙ্গালা বলতে ওর এত আটকাতো, এখন তবু অনেকটা—

ছেলেটি সুপাত্র যে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু দিগম্বর বাবুর খাঁই শুনিয়াই বৃন্দাবন নিমেষমধ্যেই বিলাত হইতে বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিল। বার হাজার একটাকা নগদ, আর মোটর একখানা ; তারপর যা যা বলিয়াছিলেন, সেগুলা আর বৃন্দাবনের কাণেই পৌঁছায় নাই।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, বার হাজারের কমে কি কিছুতেই রাজী নয় ?

তার কমে কি হয় ? বিলেত-ফেরত ছেলে !

হাজার চারেকে রাজী হয় না ?

কোন উত্তর দেওয়া বৃন্দাবন আবশ্যক বলিয়া মনে করিল না ; হুঁকাটা হাতে লইয়া বৈঠকখানা-ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

মাস-খানেক পরে আর একটি ঘটক, একটি পি. আর. এস. পাত্রের সংবাদ আনিল। ঘটক খুব ভরসা দিয়া কহিল, এইখানেই ঠিক লাগিয়ে দেবো। ভাল ক'রে আমায় খুসী করতে হবে কিন্তু। ছেলের বাবা একেবারে মহাদেব তুল্য

লোক। খাই-দাঁই কিছুই নেই; যা দেবেন, তাই তিনি খুসী হয়ে নেবেন।

সুরবালা কহিল, ছেলেটি অন্য সব দিকে কেমন?

ঘটক কহিল, রত্ন—রত্ন! এ রকম ছেলে আর সহজে মেলে না।

পাত্রের পিতার সহিত এ-পক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সত্যই প্রিয়নাথ মুখুয্যে মহাশয় সদাশিব গোছের লোক। ছেলের বিয়ে দিয়া, রাজকন্যার সহিত অর্দ্ধেক রাজত্ব গৃহে ঢুকাইবার তাঁহার সঙ্কল্প নাই। তিনি চান, মেয়েটি স্বভাব-চরিত্রে ভাল হয়, গৃহকর্ম্মে পটু হয়, একটু শিক্ষিতাও হয়, আর একটু দেখিতে-শুনিতেও ভাল হয়।

তা' আইভিকে দেখিয়া প্রিয় বাবুর পছন্দই হইল। বৃন্দাবনও ছেলে দেখিয়া খুসী হইয়া পছন্দ করিল। প্রিয় বাবু বেয়াইকে কহিলেন, দেনা-পাওনার বিষয়ে আপনি আপনার মেয়ে-জামাইকে যা দেবেন, তাইতেই আমি সন্তুষ্ট হ'ব।

স্থির হইল, দুই হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি, আংটী, মেয়েকে ৩৫ ভরি সোনা এবং মোটা-মুটি দান-সামগ্রী বৃন্দাবনকে দিতে হইবে। পাকা দেখার দিন স্থির হইয়া গেল। ঘটক সুরবালাকে কহিল, মা-লক্ষ্মী, আমাকে কিন্তু একশোটি টাকা বকশিস্ করতে হবে। তার কমে আমি কিছুতেই নেব না। সুরবালা

কহিল, ওসব কথা কর্ত্তার সঙ্গে কোয়ো। তবে আমি লুকিয়ে কিছু যা দেবো বোলেচি, তা দেবো। তবে, মেয়ের আমার ইচ্ছে, বিয়ের আগে একবার ছেলেটিকে দেখে।

ঘটক জিজ্ঞাসা করিল, খুকী কি তাই বলেছে নাকি ?

সে কথা কি আর বাপ-মাকে বলতে পারে ? তবে ভাব-ভঙ্গীতে সেই রকমটা যেন বুঝতে পাচ্ছি। হাজার হোক, এম. এ. পাশ মেয়ে, তায় ছেলেমানুষটি ত নয়। একবার নিজের চোখে দেখতে চাইবে, সেটা কিছু অন্যায় নয়। তা আইভি ছেলের বাড়ী গিয়ে ত আর দেখে আসতে পারে না। তুমি যদি ঘটক মশাই, কোন রকমে একদিন ছেলেটিকে আনতে পার। তোমার বকসিসের জন্য তুমি ভেবো না। সে তুমি পাবে।

ইহারই দিন তুই বাদে একদিন সকালে ঘটকের সহিত ছেলেটি এ বাড়ীতে আসিল। বৃন্দাবন বাড়ী ছিল না। জামাতা যে আসিবে, তাহা সে জানিত না : কারণ, এ কথা সুরবালা স্বামীকে কিছুই বলে নাই।

ঘটক ছেলেকে বৈঠকখানা ঘরে বসাইয়া সুরবালাকে খবর দিল। সুরবালা কপালের উপর পর্য্যন্ত কাপড়টা টানিয়া দিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, পরের ছেলে দুদিন পরেই ঘরের ছেলে হবে, তার

কাছে আর লজ্জা ক'রে কি করব? আইভিকে আমি ডেকেছি, একবার দেখে নিক, ওর ইচ্ছেটা একবার বাবা তোমায়......

ধীরে ধীরে আইভি মায়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি একটু নড়িয়া বসিল। কহিল, আমার অবশ্য মেয়ে দেখবার কোন দরকার ছিল না। বাবা যখন দেখেছেন, তখন আবার আমি কি দেখব? অবশ্য আজকালকার ছেলেরা নিজেরা না দেখে বিয়ে করে না। বাপ-মায়ের পছন্দের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে না। তারা সব শিক্ষিত হ'য়েছে ত? তবে আপনার মেয়ে তাদেরও ছাপিয়ে উঠেচে দেখছি। কন্যা দেখতে চায়—পাত্রকে।

সুরবালা এবং আইভি যেন একটু চমকাইয়া উঠিল।

ছেলেটি বলিতে লাগিল, আপনার মেয়ের বোধ হয় আমাকে দেখা হ'য়েছে। তা, আসতে যখন হ'ল আমাকে, আমি মেয়েটিকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এম.এ. পাশ—সে কথাটা অবশ্য শুনিছি। কিন্তু, যেটা শুনি নি, তাই দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করব।—তুমি রান্না-বান্না কিছু জান? ধোঁকার তরকারী কি ক'রে রাঁধতে হয় বল ত?

আইভির দিক্ হইতে কোন উত্তর আসিল না।

ছেলেটি কহিল, বোঝা গেল—জান না। আচ্ছা, ছেলে-

পুলের লিবারের দোষ হ'লে যে 'আলুইয়ের বড়ী' বৌ-ঝিয়েরা তৈরী করে, তা কি দিয়ে কেমন ক'রে করতে হয়—জান ?

সুরবালা কি বলিতে যাইতেছিল ; তাহাকে বাধা দিয়া ছেলেটি পুনরায় আইভিকে প্রশ্ন করিল, রামায়ণ-মহাভারত পড়েছ ? অক্ষৌহিণী বলতে কি বুঝায়, জান ?— কিছুই জান না, খালি বুঝি ঐ সস্তার এম. এ. পাশ করেছ ? ছেলেটি দাঁড়াইয়া উঠিল। আইভির সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেটি ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে কহিল, গান-বাজনায় শুনেছি নাকি খুব মজবুত। লক্ষ্মীর স্তব, নারায়ণের স্তব,—সে সবের বোধ হয় কোন বালাই নেই ?

আইভির পা তুটা কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত শরীর তাহার যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা ছেলেটিকে কহিল, দেখ বাবা, আইভি আমার—

অপদার্থ মেয়ে। আমরা লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই বটে, কিন্তু এ ধরণের মেম-মেয়ে চাই না। বাবা ত সদাশিব লোক। তবে, বিয়ে ত তিনি আর করবেন না, এই অপদার্থ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে—আমাকেই। আপনারা—

ধড়াস্ করিয়া সেইখানে তুয়ারের ধারে আইভি পড়িয়া গেল। সুরবালা ভীত চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, আইভি মূর্চ্ছা গিয়াছে।

৫

আইভির মূর্চ্ছা সহজে ভাঙ্গিল না। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বৃন্দাবন আসিল; ডাক্তার আসিল, জল, পাখা, 'স্মেলিং সল্ট', ওষুধ—অনেক ব্যাপারের পর তবে আইভি সুস্থ হইল। বৃন্দাবন মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিল, আচ্ছা, এ কাজ করতে গেলে কেন? ছেলে বাড়ীতে আনিয়ে মেয়েকে দেখানো! সমাজ রসাতলে গেছে বটে, কিন্তু এতটা রসাতলে যায় নি। এ তুমিই পথ দেখালে। কি মুস্কিলে পড়েছি আমি। তোমাকে বিয়ে করবার ফলে আমার অর্দ্ধেক মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ ক'রে বাকী অর্দ্ধেকও খারাপ হ'য়ে উঠলো!

বৃন্দাবনের মাথা খারাপ হউক না হউক, আইভির কিন্তু সেই দিন হইতে মাথারই হউক, বুকেরই হউক, কোন কল-কব্জা খারাপ হইয়া পড়িল। কি যে হইল, ডাক্তাররাই তাহা বলিতে পারে। কোথায় কোন্ স্নায়ুতে আঘাত লাগিল, মস্তিকের কোন্ শিরা-উপশিরার বৈলক্ষণ্য ঘটিল, শারীর ধর্ম্মের কোথায় ব্যাঘাত হইল, যাহার ফলে সেইদিন হইতে প্রত্যহই আইভির 'ফিট্' হইতে লাগিল। কখনও সকালে, কখনও বিকালে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও রাত্রে—সময়ের ঠিক নাই, যখন-তখনই

আইভির 'ফিট' হয়। আইভির বন্ধু-বান্ধবের দল, পাড়া-প্রতিবাসীর দল, প্রত্যহই তাহাকে দেখিতে আসে। কেহ বলে, হিষ্টিরিয়া, কেহ বলে—দুর্ব্বলতা, কেহ বলে—'বাতাস'-লাগা। তাহার বিবাহ এখন 'শিকায়' উঠিল। বৃন্দাবন তাহাকে লইয়া মহা সমস্যায় এবং চিন্তায় পড়িল।

ডাক্তাররা বলিল, Mental Derangement (মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট) ওষুধ-পত্রে বিশেষ কিছু উপকার হবে না। ওকে নিয়ে মাস দুই পশ্চিমের দিকে ঘুরে আসুন। নানা নূতন নূতন দেশ নূতন নূতন দৃশ্য দেখলে এ ভাবটা কেটে যাবে।

সেই পরামর্শই স্থির হইল। সুরবালা গৃহে রহিল। বৃন্দাবন আইভিকে লইয়া পশ্চিম-ভ্রমণে যাত্রা করিল। সুরবালা যাইবার জন্য বিশেষ ঝুঁকিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে লইল না। কহিল, তোমাকে সঙ্গে নিলেই আবার নতুন ক'রে কোন না কোন অনর্থ ঘটবেই।

বৃন্দাবন প্রথমে গেল মধুপুর। তারপর বৈদ্যনাথ। এই দুই স্থানে বেড়াইবার ফলে আইভির ফিট অনেকটা নরম পড়িল। যে ফিট প্রত্যহ একবার, কোনদিন-বা দুইবার হইত, এক্ষণে তাহা একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর হইতে লাগিল।

বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ হইতে গয়া হইয়া কাশী গেল। কাশীতে কিছুদিন কাটাইয়া বৃন্দাবন একদিন সকালে এলাহাবাদ যাইবার

উদ্দেশ্যে মোগলসরাই ষ্টেশনে এলাহাবাদের গাড়ীতে আসিয়া চাপিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে বৃন্দাবন প্ল্যাটফরমের উপর ভোলানাথকে দেখিতে পাইল। তাহাকে ডাকিতেই সে ট্রেণের হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে কহিল, মায়ের বড্ড অসুখ; তাঁকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি।

কাশী অবস্থানকালেই আইভির অসুখটা প্রায়ই আরাম হইয়া গিয়াছিল। এলাহাবাদে আসিয়া আর এক দিনও তাহার ফিট হইল না। কিছুদিন তথায় কাটাইয়া, বৃন্দাবন আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি সব জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথ ধরিল। ফিরিবার পথে তাহারা জব্বলপুর গিয়া মারবেল পাহাড় ও নর্ম্মদা প্রপাত দেখিল। এই সময়ে আইভি বলিল, বাবা যাবার সময় আর কিছুদিন কাশীতে থেকে গেলে হয়। বৃন্দাবন কহিল, বেশ। কিন্তু হপ্তাখানেকের বেশী আর থাকা চলবে না; কারণ, দু'মাস ব'লে এসেছিলুম, তিন মাস হতে চল্লো।

*　　*　　*　　*

দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস পশ্চিম ভ্রমণের পর একদিন রাত্রে দশটার সময় বৃন্দাবন কলিকাতার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আইভি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য-শ্রীর খুবই উন্নতি হইয়াছে। তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, সুরবালা

কহিল, বাবা! বাঁচলে! দু'মাসের জায়গায় চারমাস হ'তে চল্লো!—এ কে? ভোলা!

বৃন্দাবন আগাইয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ—জামাই।

জামাই? তার মানে?

তার মানে, জামাতা।

টুকু মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন বলিল, বাবাজীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা কাশীতে। মায়ের অসুখ, তাঁকে নিয়ে কাশীতে হাওয়া বদলাতে এসেছিলো। তারপর দৈবের যোগাযোগ। বাবাজীরও মত হ'ল, টুকুরও দেখলুম অমত নয়। ওর মায়েরও খুব ইচ্ছে হ'ল, সুতরাং—

সেইখানে মেজের উপর সুরবালা ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বৃন্দাবনের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। টুকু চলিয়া যাইতেছিল, ভোলানাথ তাহার উদ্দেশ্যে কহিল, টুকু—আনন্দময়ী, এস দু'জনে মার পায়ে প্রণাম করি।

উভয়ে সুরবালার পদতলে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

পুনর্মূষিক

সতর বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে তিনবার চেষ্টা করিয়াও যখন ভোলানাথ ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারিল না, তখন তাহারই মরা উচিত ছিল, কিন্তু মরিল—তাহার বাবা অনন্তচরণ। সংসারে আর কেহ নাই, ছিল ভোলানাথের গর্ভধারিণী, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বেই সীঁথির সিন্দূর ও হাতের নোয়া বজায় রাখিয়া, সতীলক্ষ্মী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল; সুতরাং যুবক ভোলানাথ কিঞ্চিৎ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া, ভোলানাথ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার মতলব করিল। দেশে জমি-জমাও তেমন কিছু ছিল না, বাড়ী-ঘরও জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, পিতৃ-পরিত্যক্ত অর্থাদিও ছিল না যে, বসিয়া ছ'মাস খাওয়া চলিবে। অনন্তচরণ সাড়ে একুশটি টাকা 'পেন্সন' পাইত, তাহাতেই সংসারটি চলিত; সুতরাং এক্ষণে দেশ হইতে ভোলানাথেরও 'পেন্‌সন' লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

তবুও পাড়ার পাঁচজন জ্ঞাতি-বন্ধু ভোলানাথকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া না যাওয়ার জন্য উপদেশ দিল, বুঝাইল। কেহ বলিল, থাকো এখানে, চলে যাবে এক রকমে। কেহ বলিল, 'জীব দিয়েছেন যিনি—আহার যোগাবেন তিনি'। কেহ বা বলিল—একটি বিয়ে-থা কর, ক'রে এইখানেই সংসারী হও। বিয়ের কথায় ভোলানাথ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, বিবাহ ? বিয়ে ? একটা পেটের চিন্তায় দেশ ছাড়তে হচ্ছে, দুটো পেটের চিন্তায়, তা হ'লে ত' আমাকে পৃথিবীটাই ছাড়তে হবে।

সুতরাং ভোলানাথ দেশের মায়া, জন্মস্থানের—না, জন্ম তাহার দেশে হয় নাই, অনন্তচরণের কর্ম্মস্থল কলিকাতায় ভবানীপুরে হইয়াছিল—তাহা হইলেও সাত পুরুষের ভিটার মায়া, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মায়া কাটাইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য একদিন সে বিদেশে যাত্রা করিল।

প্রথমে সে কলিকাতায় গেল। সেখানে সে এক বইয়ের দোকানে একটা কাজ যোগাড় করিয়া ফেলিল। এই কাজে তাহার দিন বেশই কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এক বৎসর কাজ করিবার পর,আট আনা মুল্যের একখানি গল্পের বই চুরি করাতে তাহার চাকুরীটিও গেল এবং পুলিস ও পুলিস-কেসের ভয়ে তাহাকে কলিকাতাও ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

পলাইবার সময়, এক বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল, যদি

রেঙ্গুণে যেতে পার, তাহ'লে আর তোমার চাক্‌রীর অভাব হবে না। এখানে-ওখানে না গিয়ে, চ'লে যাও—রেঙ্গুণ।

কিন্তু ভোলানাথ গেল—বেনারস।

বেনারস আসিয়া ভোলানাথ দেখিল, ঠিক স্থানেতেই সে আসিয়াছে। আর কিছু হউক, না হউক, এখানে অন্নচিন্তায় তাহাকে কাতর হইতে হইবে না। কেন না, ব্রাহ্মণের ছেলে, কোনও 'সত্রে' খাইয়া তাহার দিন বেশ চলিয়া যাইবে।

সত্যই তাহার দিন বেশই কাটিয়া যাইতে লাগিল। সকালে গঙ্গার ঘাটের হাওয়া খায়, তাহার পর চায়ের দোকানে চা খায়, সিগারেট খায়; তাহার পর নয়টা বাজিলে স্নান করিয়া বাজার করিতে যায়। বাজারটা তাহার জন্য নয়—অপরের। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীর বাহিরের দিকের একখানা ঘর বিনা ভাড়ায় তাহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ ভোলানাথকে তাঁহাদের বাজারটা করিয়া দিতে হইত। এই বাজার করার ফলে, তাহার দৈনিক দু'এক আনা পকেট-খরচটা উঠিয়া যাইত। তাহার পর বাজার হইতে আসিয়া সে 'সত্র' হইতে খাইয়া আসিত। কাশীতে 'ষোল আনা' 'অধিষ্ঠান' নামে যে ব্যাপারগুলি আছে, তাহা হইতেও তাহার প্রতি মাসে কিছু কিছু পাওনা হইত। তাহাতেই তাহার অন্যান্য ব্যয়াদি বেশ ভালভাবে না হইলেও এক রকমে নির্ব্বাহ হইত।

এমনিভাবে এক আধ দিন নয়, পূরা তিনটি বৎসর ভোলানাথের কাশীতে কাটিয়া গেল। তিন বৎসর পরে হঠাৎ যে দিন শীতান্তে কাশীতে বসন্তের প্রথম হাওয়া বহিয়া তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল, সেই দিন সে মনে মনে স্থির করিল, সে বিবাহ করিবে।

বাজারে আসিবার পথে 'মিলনালয়' নামে একটি বিবাহের আফিস ছিল। এখন হইতে মধ্যে মধ্যে ভোলানাথ 'মিলনালয়ে' আসিয়া বসিতে লাগিল।

একদিন একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিবাহ আফিসে আসিয়া বসিলেন ও বিবাহ আফিসের কর্ত্তা মধু বাবুর সহিত নানারূপ গল্প-গাছা করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ সে সময় উপস্থিত ছিল। ভদ্রলোকটি উঠিবার মুখে, মধু বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ ছেলেটি? মধুবাবু কহিলেন, ছেলেটির বাড়ী কলকাতায়, এখানে মাঝে মাঝে এসে বসে।

ভোলানাথ কহিল, কলকাতায় নয়, আমাদের বাড়ী আমতার ঐ দিকে।

তোমার নাম কি?

ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য।

তোমার বাবার নাম?

৺অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য।

তোমার বাবা কতদিন মারা গেছেন ?

বছর পাঁচেক হ'ল।

মা ?

মা-ও তার মাস পাঁচ ছয় আগে মারা যান ;

তোমার একটি বড় বোন ছিল না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দিদি শ্বশুরবাড়ীতে আছে।

ভদ্রলোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সস্নেহে ভোলানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, এস আমার সঙ্গে।

বাসায় আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন, অনন্তর ছেলে।

গৃহিণী কহিলেন, কে অনন্ত ?

ভবানীপুরে আমাদের বাসার পাশেই থাকত—সেই অনন্ত ভট্‌চার্য্যি ; আলীপুর কোর্টে কাজ করত।

গৃহিণী চক্ষু দুইটা কপালের উপর তুলিয়া কহিল, ও মা! তাই বল ; আমাদের অ-ন-ন্ত বাবু! মাগো! সেই খোকা এত বড় হয়েছে ?

তোমার সেই পারুলটিও যে কত বড় হয়েছে! কিন্তু মজাটি দেখ একবার! একে আজ এইভাবে পাব বলেই, পারুলের বিয়েতে যেন কেবলই দেরী হচ্ছিল। কত দিন ধ'রে অনন্তর আর আমার পরামর্শ। ঐ দেখ, আমাদের সেই

আমগাছ থেকে পড়ে গেছলো, ঐ তার দাগ। বসো বাবা।

ভদ্রলোকটি অতিরিক্ত আনন্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা চাঁপার নাম ধরিয়া বার বার ডাকিতে লাগিলেন, আর ভোলানাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'মিলানলয়ে' মাঝে মাঝে যাওয়া আমার যেভাবে আজ সফল হ'তে চলেছে, এই রকম যদি সব কাজেই হয়!

সফলই হইল।

দুই বন্ধুর মনের তুলিতে আঁকা, যে ছবি পনর বৎসরের দীর্ঘ অবকাশে প্রায় মুছিয়া যাইবার মতই হইয়াছিল, তাঁহাই হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

অর্থাৎ অপুত্রক কেদার বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পারুল-রাণীর সহিত নববর্ষের এক শুভদিনে, অভিনব আনন্দোৎসবের সঙ্গে, ভোলানাথের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

২

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

কি একটা কথা লইয়া পারুলরাণী স্বামীর কথাটার কোন উত্তর না দিয়া, শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চলিয়া

যাইতেছিল। কিন্তু ভোলানাথ ছাড়িবার পাত্র নহে। পারুলের আঁচলের প্রান্তভাগ টানিয়া ধরিয়া বিষম ক্রোধের সহিত বলিল, কথাটার জবাব দিয়ে যাও, বৌরাণী!—বৌরাণী কথাটার উপর এমন একটা বিদ্রূপের রং চড়াইয়া ভোলানাথ উহা উচ্চারণ করিল যে, পারুলের কণ্ঠাবরুদ্ধ সোজা জবাবটা কিঞ্চিৎ বাঁকা ও বিষাক্ত হইয়া বাহির হইল, যার ক্ষমতার দৌড়—শ্বশুরবাড়ীতে ব'সে ব'সে শ্বশুরের অন্ন-ধ্বংস করা পর্য্যন্ত, তা'কে ব'লে ক'য়ে, অনুমতি নিয়ে যা'বার দরকার হয় না। বরঞ্চ, তোমার কোথাও যেতে হ'লে আমার কাছে অনুমতি নেওয়া দরকার। বুঝলে?

যে বুঝিবে, তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিল, চোখ দিয়া আগুনের হল্কা ছুটিল, বলিল—বটে!

গ্রীবা দোলাইয়া পারুল কহিল, হ্যাঁ।

আচ্ছা! বলিয়া ভোলানাথ হঠাৎ একবারে নীরব হইয়া পড়িল এবং মুখ ফিরাইয়া বসিল। পারুল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল—এমন কিছুই নয়। পাশের বাড়ীর মেয়েরা দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধে পারুলও তাহার মাতার মত লইয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল। ভোলানাথ তখন আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছিল বলিয়া, পারুল আর তাহাকে ডাকে নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পারুল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কর্ত্তাটির রাগ হইয়াছে। সুতরাং মুখখানা তাঁহার হাঁড়ী, বাক্ বন্ধ এবং সেল্‌ফের উপর হইতে ছোট খুকীর 'কথামালা' বইখানা হাতে লইয়া তৎপ্রতি গভীর মনঃসংযোগ। ছোট খুকী, পারুলের দিদির কন্যা। পারুল কহিল, কি গো, বাঘ ও বকের গল্প মুখস্থ করছ না কি ?

ভোলানাথ নিরুত্তর।

চা খাবে ? আনবো ?

ভোলানাথ নির্ব্বাক্ হইয়া অতঃপর মাছি ও মধুর কলসীর পাতাটা উল্টাইয়া, তাহাই একান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিল।

বেগতিক দেখিয়া পারুল চলিয়া গেল এবং খানিক পরেই চায়ের কাপ হাতে লইয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া, স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোলানাথ চকিতে তাহার হাত হইতে কাপ্‌টি ছিনাইয়া লইয়া তাহা জানালার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কাচের ডিস বাটি জানালার গরাদেতে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; চা'য়ের জল ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, বচসা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ প্রভৃতি। তাহার পর সর্ব্বশেষে 'আচ্ছা' বলিয়া ভোলানাথ মুখ ফিরাইয়া বসিল।

মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল অনেক-কিছু ভাবিবার পর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিল, তখন ভোলানাথ একটু নড়িয়া উঠিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গেঞ্জীর উপর পাঞ্জাবীটা চড়াইয়া, চা খাইবার মতলবে, রাস্তার মোড়ের চা'য়ের দোকানটার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

দোকানের মধ্যে যে লোকটি একহাতে একখানি বই ও অন্য হাতে চা'য়ের কাপ ধরিয়া চুমুকে চুমুকে চা পান করিতেছিল, ভোলানাথকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, আরে, জামাইবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? ভোলানাথ পাশের চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া প্রশ্নকারীর হাতের বইখানা লইয়া একস্থানে খুলিতেই, তাহার নজরে পড়িল, সেখানটাতে লেখা রহিয়াছে—

খোসামুদের চেয়ে অধম
কোথায় গেলে পাই?
তা'র চেয়েও অধম পাবে
যে জন ঘর-জামাই।

লোকটি কহিল, এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন, জামাইবাবু? শরীরটা যেন ভাল নেই মনে হচ্ছে।

বইখানাকে ধপাস করিয়া সম্মুখের টেবলটার উপর ফেলিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাইয়া ভোলানাথ বাহির হইয়া গেল ও অদূরের পার্কের বেঞ্চে গিয়া বসিল।

রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত পার্কের সেই বেঞ্চখানিতে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিবার ফলে, পরদিন অতি প্রত্যূষে একটা সুটকেশ হাতে ঝুলাইয়া ভোলানাথ শ্বশুরালয় হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বরাবর হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া ছ'টা পঞ্চান্নর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল ভোলানাথ পাণ্ডুয়া নামিয়া, তাহার মাতুলালয় মছলন্দপুর যাইবে।

তাহাই গেল। সেখানে বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া তাহার মামা কহিলেন, কে গো, আমাদের ভুলি না? বলি, কোন্ দিক্‌কার হাওয়া কোথায় বইছে! আছিস্ ভাল ত?

মামীর কোলের মেয়ে, তিন বছরের ক্ষান্তকালী, নগ্ন দেহে উঠানের একপার্শ্বে একটি ঢেঁকির উপর বসিয়া মূড়ি খাইতে-ছিল। সে মায়ের কাছে নাচিতে নাচিতে আসিয়া যতদূর পারিল তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে, মা?

মা কহিল, তুই আর চিনবি কোত্থেকে; তোর দাদা হয়। তা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো বড়লোকের ছেলে? দাওয়ার উপর উঠে গে বসো।—বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখে একটা অপ্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি মুখখানাকে ফিরাইয়া লইয়া ভোলানাথের মাতুলের উদ্দেশে কহিলেন, মিন্‌ষে সেই কখন্ হাটে গেছে, এখনো ফেরবার নাম নেই! গোটা হাট্‌টাই বুঝিবা কিনে আনছে। সব দিক্ দিয়ে যেন আমায় জ্বালিয়ে

পুড়িয়ে খেলে! এই যে কুটুমের ছেলে এলো, কি দিয়ে তারে একটু জল খেতে দি, তোমরা সব বল দেখি একবার! আমার মরণ হোলে যেন বাঁচি।

দাওয়ার উপর একখানা তালপাতার চেটাই ছিল, তাহা পাতিয়া ভোলানাথ বসিয়া পড়িল।

মিনিট পনর পরে তাহার অন্যতম মামাত বোন কালী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, বাড়ীর বাহির হইতেই চীৎকার করিতে লাগিল, কে এসেছে, মা? দেখিতে দেখিতে তাহার অন্যান্য মামাত ভাইবোনগুলিও—বামা, কেষ্ট, যদু, নন্তু, পিকু, রাধা এবং থাকো —কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিছুদিন পূর্ব্বে, কোন মাসিকপত্রে ভোলানাথ একখানা ছবি দেখিয়াছিল। তাহাতে ক্ষীণাঙ্গ অপুষ্ট সন্তানবাহিনী-বেষ্টিত, জ্বালাগ্রস্ত কর্ত্তা গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী?' আজিকার এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সেই ছবিখানির কথা মনে পড়িল! চিত্রকর কি ছবিখানি আঁকিবার আগে এ বাটীতে কোন দিন আসিয়াছিল? তাহার এই বিপুল ভাই-ভগিনীর দল, কেহ সবাক্, কেহ নির্ব্বাক্ অবস্থায় তাহার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, কেহ গা ঘেঁসিয়া কোলের কাছে, কেহ-বা তাহার মাথা ঘেঁসিয়া কাঁধের কাছে, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ হাঁটু গাড়িয়া

তাহার মুখের দিকে যখন সোৎসাহে এবং সপুলকে দৃষ্টিদান করিতে ব্যস্ত, সেই সময় মস্ত একটা পোঁটলা কাঁধে করিয়া মাতুল রতিকান্ত বাটী প্রবেশ করিয়া হাঁকিলেন, কোথা গো, ছোট-গিন্নী ?

ছোট-গিন্নী গোয়ালের মধ্যে কিছু-একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, ভুলি এসেছে।

ভুলি!—কে ভুলি ?

তোমার ভাগ্‌না গো!

৬

প্রায় একমাস হইতে চলিল, ভোলানাথ মাতুলালয়ে কাটাইতেছে। কিন্তু কি দুঃখে, কত মনোবেদনায় যে তাহার এক একটি দিন কাটিয়াছে ও কাটিতেছে, তাহা শুধু ভোলানাথ ও ভোলানাথের অন্তর্য্যামীই জানেন। এখানে আসিবার পর সপ্তাহ-খানেক কাল সে একটু মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া গাঁয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবার অবসর পাইয়াছিল।

কিন্তু ঐ এক সপ্তাহের পর, চোখ-ঢাকা বলদের কাঁধে যেমন ঘানি জুড়িয়া দিয়া দিবারাত্র তাহাকে ঘোরানো হয়, তেমনই ভাবে ভোলানাথের মামা ভোলানাথের স্কন্ধে রং-বেরংয়ের কাজের ঘানি চাপাইয়া দিয়া তাহার দম ফেলিবার অবকাশটুকুও কাড়িয়া লইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে, পাছে ভোলানাথ হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া অপঘাতে মরিয়া যায়, সে জন্য তাহার চোখ দুইটা ঢাকিয়া না দিয়া খোলা রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভোলানাথের দৈনিক কার্য্য-বিবরণী নিম্নোক্তরূপ—

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাকে মামার পূজা করিবার ফুল তুলিয়া আনিতে হয়। মামা রতিকান্ত এ সম্বন্ধে ভাগিনেয়কে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া বলে, ইহাতে তাঁহার অপেক্ষা ভোলানাথেরই উপকার বেশী হইতেছে অর্থাৎ বিনামূল্যে প্রভাতের 'বীর-বায়ু' তাহার সেব[illegible]ছে।

তাহার পরেই স্নান।

স্নানান্তে তিন মাইল দূরবর্ত্তী দেবীপুরের মুখুয্যেদের বাড়ী গমন এবং তাঁহাদের নারায়ণের নিত্যপূজা করা। দেবীপুরের মুখুয্যে-বাড়ীর ঠাকুর-পূজা, রতিকান্তের উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ করিয়া আসিতেছে। মাসে চারিটি করিয়া টাকা এবং প্রত্যহ পূজার পাঁচ পোয়া আন্দাজ চাউল এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্য রতিকান্তের প্রাপ্য হয়। এই কাজটিতে রতিকান্তের

সুবিধা ছিল যেমন, পথের দূরত্ব তেমনই অসুবিধার ছিল। এক্ষণে ভোলানাথের উপর কার্য্যভার দেওয়াতে অসুবিধাটুকু দূর হইয়া নিছক সুবিধাটুকুই তাহার লাভ হইতেছে। বলা বাহুল্য, সন্ধ্যাকালেও ভোলানাথকে আর একবার তথায় যাইতে হয় এবং ঠাকুরের 'শীতল' দিয়া আসিতে হয়।

বেলা ১টা হইতে ২টা—আহারাদি। তৎপরে অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ সময়—বিশ্রাম। তৎপরে খড় এবং খড়-কাটা বঁটি লইয়া ভোলানাথের হস্ত দুইটিকে বহুক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কারণ, মামার হাতে বাতের বেদনার জন্য, এই কাজটি তিনি প্রীতির সহিত প্রীতিভাজন ভাগিনেয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। গো-সেবার এই আয়োজন করিতেই ভোলানাথের অপরাহ্ণ হইয়া আসে; যেহেতু গাভী একটি নয়—স-বৎস এবং অ-বৎস লইয়া সাতটি।

অতঃপর—নিত্যকার দোকান করা। দোকান হইতে নিত্য উঠ্‌নায় দ্রব্যাদি আনা, ইহা এক্ষণে ভোলানাথেরই কার্য্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু নগদ পয়সায় হাট করা কাজটি রতিকান্ত নিজ হাতেই রাখিয়াছে।

সর্ব্বশেষে—দেবাপুরে গিয়া 'শীতল' দিয়া আসিবার পর, মামাত ভাই-ভগিনাগুলিকে লইয়া গল্প করিয়া ভুলাইয়া রাখা। তন্মধ্যে কাহারও পেটব্যথা করিয়া উঠিল, তাহাকে খিড়কার

বাঁশ-বাগানে আলো লইয়া দাঁড়ানো; কাহাকেও বা পায়ের উপর চাপাইয়া 'ঘু-ঘু-মেতিস্থ' খেলা দেওয়া এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ ভগিনী ক্ষান্তকালীকে কোলের উপর ফেলিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি।

মাতুলানী ভোলানাথকে শুনাইয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, বেটা ছেলে কি চুপ ক'রে ব'সে থাকা ভাল; কথায় আছে—

খাটে-খোটে, দুধ ভাত,
নি-খাটুনীর শুধু হাত।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, নি-খাটুনীর পরিবর্ত্তে এত বেশী খাটিয়াও ভোলানাথের পাতে এক ফোঁটাও দুধ কোন দিনই পড়ে না। শুধু প্রত্যহ গাদা গাদা খড় কাটিয়াই সে সারা হয়।

মামা রতিকান্ত ভাগিনেয়কে উপদেশ দেয়,—শাস্ত্রে বলে, সাদাসিধে দুটি অন্ন আহার করবে, পরিশ্রমের দ্বারা জীবনের দিন কাটিয়ে দেবে, গুরু আর গরুর সেবা করবে আর অবসর সময়ে আত্মোন্নতির চিন্তা করবে।

রাত এগারটার পর, সাদা-সিধা দুটি অন্ন আহার করিয়া যখন ভোলানাথ অবসর লাভ করে, তখন মাতুলের শাস্ত্রবাক্য অনুসারেই সে আত্ম-চিন্তাই করিয়া থাকে। সে চিন্তা করে, সে কি ছিল আর এই একমাসের মধ্যে তাহার হাল কি হইয়াছে! এক এক দিন তাহার বুক ফাটিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়। জীবনে

কখনও তাহাকে গরুর বিচালী কাটিতে হয় নাই, কখন ঠাকুর-পূজাও করিতে হয় নাই। নারায়ণ-পূজার মন্ত্রও সে জানে না। রতিকান্ত ধমক দিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, মন্তরের দরকার হয় না। পূজোর জায়গায় গিয়ে কেউ আর তোমাকে এগ্‌জোমিন্যান্‌স্থান্‌ করতে যাবে না। গায়ত্রীটা জান ত? মনে মনে তাই বলতে বলতে ঠাকুরকে স্নান করাবে, 'বেশ' করাবে, তারপর ফুল-চন্দন দিয়ে নমঃ নমঃ ক'রে পূজো করবে। ভোলানাথ সেই হিসাবেই কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু রাত্রিতে শুইয়া সে তাহার নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বলে,—ঠাকুর,অপরাধ নিও না। অনেক পাপ করেছিলুম, তাই মামার বাড়ীর এই চরম দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হচ্ছে। এর ওপর আরও পাপ বাড়াচ্ছি, জানি না, আরো কত দুর্ভোগ বরাতে আছে। কিন্তু আর পাপ বাড়া'ব না। এ স্থান শীগ্‌গিরই ত্যাগ করব। ত্যাগ ক'রে যাবই বা কোথা? পারুলের কাছে আর যাব না। মথুরাপুরীতুল্য যে শ্বশুরবাড়ীতে তিন দিন বাস করিবার পরে ঝাঁটার ব্যবস্থা—সনাতন প্রথা, সে শ্বশুরবাড়ীতে আর মাথা গলান হ'বে না। কিন্তু—কিন্তু—যাই-ই বা কোথা? গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভোলানাথ নিদ্রা ভুলিয়া, তাহার গন্তব্য স্থানের কথাই চিন্তা করে। কিন্তু কোন কিনারা কোনদিনই সে দেখিতে পায় না। একদিন চিন্তা করিতে করিতে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শয্যার উপর

য়া বসিল। মনে মনে বলিল, কোথাও আর যাব না—মরবো। এ প্রাণকে বিসর্জ্জন দেব। আপন হাতে আত্মহত্যা করব না, অপরের দ্বারা এ প্রাণকে হত্যা করা'ব। মাঠে গিয়ে সাপের গর্ত্তে পা দিয়ে ব'সে থাক্‌বো ; সাপ ছোবল মারবে, আর সেইখানেই মরে পড়ে থাকবো।

রাত বোধ হয় তখন দুইটা। দুশ্চিন্তায়, অবসাদে, ধিক্কারে ভোলানাথ নিঃসাড়ে মাতুলালয়ের মলিন ছিন্ন শয্যা ত্যাগ করিয়া গ্রামের বাহিরে, মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশ দিয়া একটা শিয়াল ছুটিয়া গেল। ভোলানাথ ভাবিল, শিয়াল না হয়ে, ও যদি বাঘ হতো! মাথার উপর দিয়া সাঁই সাঁই করিয়া একটা রাত-চরা পাখী উড়িয়া গেল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যদি শকুনি হোস্, তা হ'লে আর ঘণ্টা কতক পরে এই মাঠে আসিস্,আমার মরা দেহটা নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে পাবি।
—এই একটা সাপের গর্ত্ত না? ভোলানাথ সেই গর্ত্তের মুখে পা পাতিয়া দাঁড়াইল। গর্ত্তের মধ্যে একটা ব্যাঙ ছিল,সে ভয় পাইয়া, পলাইবার অভিলাষে অনবরত লাফাইয়া ভোলানাথের পায়ের তলায় ঢুঁ মারিতে লাগিল। ধুত্-তেরি বলিয়া ভোলানাথ মাঠের আর খানিকটা আগাইয়া গিয়া আর একটা গর্ত্তের উপর পা দিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু কোন বিষধর আসিয়া তাহার পদতলে ছোবল দিল না। তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একটা

গর্ত্তের মুখে পা দিল। এখানেও তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন সে মাঠময় ঘুরিয়া সাপের গর্ত্ত খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু আর গর্ত্ত খুঁজিবার আবশ্যক হইল না। একটা 'আইলে'র উপর পা ফেলিয়া ডিঙ্গাইতেই, সর্প তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কামড় দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সে বসিয়া পড়িয়া. বাঁধন দিবার জন্য পরিহিত কাপড়খানার একটা প্রান্ত ফালি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, করচি কি? মরণের জন্যই ত এসেচি! ভোলানাথ তখন সেইখানে সেই 'আইলে'র উপরই অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার শক্তি যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে যেন সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় বুজিয়া আসিল।

কিন্তু কই—মৃত্যু ত হইল না। এক ঘণ্টা. দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল, মৃত্যু ত' হয় না; জ্ঞান ত' লোপ হয় না! এদিকে ভোর হইয়া আসিল। পূর্ব্ব-গগনে রবি উদয়ের আয়োজন দেখা দিল; চারিদিক্ ফর্সা হইল। ভোলানাথ তখন উঠিয়া বসিয়া পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, খানিকটা শুক্‌না শিয়াকুল-কাঁটার সরু ডাল তাহার পায়ে জড়াইয়া রহিয়াছে। হায় ভগবান্! ভাগ্যদোষে সাপ না হইয়া, হইল—শাখা!

কিন্তু ভোলানাথ আর মামার গৃহে ফিরিল না। সোজা

ষ্টেশনের দিকে চলিল। সকালের প্রথম গাড়ী আসিতে বড় বেশী দেরী ছিল না।

ভোলানাথ মেমারীর টিকিট কিনিল। সে তাহার ভগিনী-পতির গৃহেই একবার যাইবে। সেখানে ঠাকুর, গরু এবং ছেলে-পুলের পাল না থাকিলেও তাহার ভগিনীপতির একপাল ছাগল আছে, তাহা সে জানিত। হয় ত' সারাদিন ধরিয়া সেখানে সেই ছাগলের পাল তাহাকে চরাইতে হইবে। হউক; তবু একবার সে সেখানে যাইবে।

৪

ভগিনীর বাটীতে আসিয়া, ভগিনীপতির সহিত তাহার নিম্নোক্তরূপ কথা-বার্ত্তা হইল—

আচ্ছা দাদা, আপনার সেই ছাগলগুলো আছে ?

না ভাই, দিয়েছি বিক্রী ক'রে। চরাবার এক জন ভাল লোক না পাওয়া গেলে———

আবার কিনবেন নাকি ?

নাঃ, ওসব হাঙ্গামা আর করব না ; লাভ যদিও আছে বেশ, কিন্তু বড় ঝঞ্ঝাট।

ভোলানাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

আচ্ছা, ভোলানাথ !

আজ্ঞে।

একটা কাজ করলে হয় না ? শুধু শুধু বিনা কাজে এখানে ব'সে ব'সে দিন কাটালে শরীরটা ত ভাল থাকবে না। আমি বলি কি, গাঁয়ে একটা পাঠশালা যদিও আছে, তা ব'লেও এ পাড়ায় নেই।

তা, আমি একটা এ পাড়ায় খুলে দেবো বলছেন ?

মন্দ কি ? তা হ'লে ৪।৫ টাকা যা ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে উঠবে, সেটা তোমার দিদির হাতে দিলে, তোমার দিদিরও আহ্লাদ হবে, আর একটা কাজ নিয়ে থাকলে তোমারও শরীরটা ভাল থাকবে। নইলে, এ ম্যালেরিয়ার দেশে হয় ত টপ্ ক'রে ম্যালেরিয়া ধ'রে যাবে।

মশা থেকে ত ম্যালেরিয়া হয় দাদা ; গুরুমশাই সেজে না বসলে যে ম্যালেরিয়া———

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠশালা খোলাই হইল। ছোট একটা কাঠের ফলকে আলকাতরার পোঁচড়া দিয়া লেখা হইল —**ভোলানাথ পাঠশালা**। তাহা পাঠশালা-ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

পাঠশালা রোজ সকালে বসে, বিকালে বসে। এ পাড়ার

যে-সব ছেলে ও-পাড়ার পাঠশালায় পড়িতে যাইত, তাহাদের অনেকেই ভোলানাথ পাঠশালায় ভর্তি হইল। সুতরাং ও-পাড়ার গুরুমহাশয়ের ভীষণ ক্রোধ হইল—এ-পাড়ার গুরুমহাশয়ের উপর। তিনি কয়েক জন বয়স্ক পড়ুয়ার কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। পরদিন রবিবার তিনি সকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে এ পাড়ায় আসিয়া ভোলানাথের ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোলানাথ বাবু সম্পর্কে আপনার কে হ'ন ?

ভোলানাথ ? আমার শালা হয়।

সাইন বোর্ডেও তাই লেখা আছে বটে।

তাই লেখা আছে কি রকম ?—ভোলানাথের ভগিনীপতি লাফাইয়া উঠিল।

আজ্ঞে, সেই কথাই ত লেখা আছে।

তখন উভয়েই পাঠশালা-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, সত্যই তাই বটে। কাষ্ঠ-ফলকে লেখা 'ভোলানাথ পাঠশালা' হইতে 'পাঠ' কথাটা কে বা কাহারা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া বে-মালুম তুলিয়া দিয়াছে।

এই সূত্রে ব্যাপার ঘটিল কিন্তু গুরুতর। এ গাঁয়ের ছেলে-গুলা ছিল অত্যন্ত অসভ্য এবং দুষ্ট। এই ব্যাপারের পর গাঁয়ের ছেলের দল, বিশেষতঃ ও পাড়ার ছেলেরা, ভোলানাথকে

দেখিলেই তফাৎ হইতে 'পাঠ' বর্জ্জিত তাহার সাইন-বোর্ডখানা বার বার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকিত। শেষকালে ভোলানাথের পথে বাহির হওয়াই দায় হইল। তথা কথায় কথায় একদিন তাহার ভগিনীপতি কহিল, ভাবছি—গোটা কুড়ি ছাগল না হয় আবার কিনে ফেলি। সেই দিনই ভোলানাথ স্থির করিল, আর এখানে থাকা নয়। একে, এই অসভ্য ছেলের পাল, তার ওপর যদি ছাগলের পাল এসে ঘাড়ে পড়ে, তা হ'লে——নাঃ, কালই সরে পড়তে হবে। এবার আর অন্য কোথাও যাচ্ছি না। নিজের দেশেই গিয়ে থাকবো। যদিও ঘর-দোর এই দশ বছরে সব পড়ে ভূমিসাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু জ্ঞাতি খুড়ো রয়েছেন, তাঁর ওখানেই গিয়ে উঠব। তারপর দু'টি পেটের অন্ন, যেমন ক'রে হোক হয়ে যাবেই।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ভোলানাথ ভগিনীপতির গৃহ হইতে চুপি চুপি নিষ্ক্রান্ত হইল। যে মেমারীর ষ্টেশনে কয়েকদিন আগে সে অনেক-কিছু আশা করিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়াছিল, সেই মেমারী ষ্টেশনে আসিয়া, উজান বাহিয়া যাইবার জন্য আবার ট্রেণে চাপিয়া বসিল।

৫

আমতায় ভোলানাথের পৈতৃক বাটী। দশ বৎসর দেশ ছাড়িয়া যাওয়াতে, মাটীর ঘরগুলি মাটীর উপর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সারা ভিটাবাড়াটা জঙ্গলে পূর্ণ। তথায় যাঁহারা এক্ষণে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা দিনের বেলা এক দণ্ডের জন্যও ভিটা ত্যাগ করেন না, করেন—রাত্রে। দিনের বেলা কেহ বড় গর্ত্তের মধ্যে চামরের মত লেজ নাড়িতেছেন, কেহ দেয়ালের ফাটলের ভিতর মাথা ঢুকাইতে ঢুকাইতে ফোঁস্ ফোঁস করিতেছেন, কেহ বা ভাঙ্গা গোয়ালের আড়ার মধ্যে ঝটা-পট্ শব্দে পক্ষ-তাড়না করিতেছেন, সুতরাং জ্ঞাতি খুড়ার গৃহে গিয়াই তাহাকে উঠিতে হইল। খুড়ী একটু অসন্তুষ্ট হইলেও, খুড়া খুবই আদর-যত্ন করিয়া ভোলানাথকে গ্রহণ করিলেন। খুড়ী খুড়াকে অন্তরালে ডাকিয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন, আচ্ছা, তোমার আপন ভাইপো নয়, তা এত খাতির-যত্ন ক'রে যে রাখছ, বলি টাকা কড়ি কি তোমার বেশী হয়েছে কিছু?

খুড়া কহিলেন, মাস তিন চার থাকবে হয় ত; তাতে আর এমন কি খরচ ওর প্রতি——

বলি, যদি ছ'টা মাসই থাকে. তা হ'লেও পাঁচ টাকা হিসেবে তিরিশটে টাকা ত!

তা বটে; তেমনি তিনশোটি টাকা আবার এদিকে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলবো কি না!

খুড়ী হাঁ করিয়া খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, হলধর বামুন কাঁচা কাজ করে না। বুঝলে, গিন্নী? ছ'মাসের ভেতরেই ওর একটা বিয়ের যোগাড় ক'রে ফেলব। আর তা হ'লেই অন্ততঃ তিনশোটি টাকা সিন্ধুকে পূরেছি জানবে।

কথাটা শুনিয়া খুড়ীরও মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। খুড়ার ত' প্রফুল্ল হইয়াই ছিল। আর ভোলানাথ ত' এ বাটীতে আসা অবধি—প্রফুল্ল। কিন্তু তাহার প্রফুল্লতা শীঘ্রই নিভিয়া গেল, যখন সে দেখিল যে, তাহাকে পাত্র হিসাবে দেখিবার জন্য অনেক কন্যার পিতা এ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। খুড়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই বলেন, এমন ছেলে আজকালকার বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না, মশাই; রত্নবিশেষ। তাঁহারা আসিয়া ভোলানাথকে প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি বাবাজি?

ভোলানাথ মাথা হেঁট করিয়া তাহার নাম বলে।

পড়াশুনো কতদূর করেছিলে?

ম্যাট্রিক ফেল ক'রে আর পড়ি নি।

খুড়া কহেন, ভয়ানক অসুখটা হ'ল, তাইতে আর—নইলে 'স্কলেরসিপ'টা ত ওরই পাওনার কথা ছিল।

তোমার কপালে ও দাগটা কিসের, বাবা?

ছেলেবেলা আম গাছ থেকে পড়ে গিছলুম।

কিন্তু ভোলানাথ মহা সঙ্কটে এবং সমস্যায় পড়িল। সে যে বিবাহিত, এ কথা তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহই জানিত না, তাহার মামাও নয়, তাহার ভগিনীপতিও নয়, তাহার জ্ঞাতি খুড়া হলধরও নয়। সকলেই জানিত, ২০ বৎসর বয়সের সময় সে গ্রামত্যাগ করিয়া বিদেশে কোথাও গিয়া আইবুড়া জীবন যাপন করিতেছে। সে যে আজ পাঁচ বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছে এবং শ্বশুরবাটীতেই ঘর-জামাই হইয়া আছে, এ কথা সে সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। এক্ষণে পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হলধর খুড়ার যত্নে ও চেষ্টায় তাহার পুনর্বিবাহের আয়োজন দেখিয়া সে ঘোর সমস্যায় পড়িল এবং সেই সমস্যা আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল তখন, যখন একদিন হলধর তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে পরম স্নেহভরে কহিলেন, অমত যেন কোরো না, বাবা! আইবুড়ো হয়ে কি থাকতে আছে? মেয়েটি

রূপেও ভাল, গুণেও ভাল। শ্বশুরের পয়সা-কড়ি আছে। তাঁর ওখানেই দিব্যি ঘরের ছেলের মত থাকবে। আর—

ভোলানাথ মনে মনে আঁৎকাইয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ এখানেও ঘর-জামাই!

সারা রাত ভোলানাথের চোখে আর নিদ্রা আসিল না। আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই সে ভাবিতে লাগিল। এর চেয়ে তার ভগিনীপতির ছাগলের পাল আর পাঠশালার সাইনবোর্ড অনেক ভাল ছিল। নাঃ! এখানেও থাকা হ'ল না। কাল ত' পাকা দেখা দেখতে আসবে। মহা মুস্কিল হ'ল দেখছি! যাওয়া যায়ই বা কোথা? শ্বশুরবাড়ী কিন্তু আর ঢোকা হবে না! কিছুতেই না।

সারা রাত্রির অনিদ্রার চক্ষু চাহিয়া ভোলানাথ বাহিরের দিকে দেখিল, পূর্ব্বাকাশ যেন একটু ফরসা হইয়া আসিয়াছে। ভোলানাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং নিজের সুটকেসটি গুছাইয়া লইয়া ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিল।

ট্রেণের যে কামরাটীতে সে উঠিল, সেই কামরাটির মধ্যে একটিমাত্র ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার যাওয়া হবে কোথা? ভোলানাথের মন খুবই খারাপ ছিল, কহিল, যেখানে হোক যেতেই হবে এক

জায়গায় ; সেটা হাওড়ায় গিয়ে ঠিক করব ; তবে যমের বাড়া যেতে পারলেই ভাল হয়। লোকটি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ভোলানাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি বেশ অর্থশালী এবং সহৃদয়। সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া ভোলানাথ নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, আমার কলকাতা এষ্টেটের জন্যে একজন লোকের দরকার। আপনি এক কাজ করুন না ; যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে না হয়, আমারই কাজটায়——।

যুক্তি স্থির হইয়া গেল, যোগেশ বাবুর কলকাতা এষ্টেটেই ভোলানাথ কার্য্য করিবে। হঠাৎ পথ চলিতে যে এমন একটা সুন্দর সুযোগ পাওয়া যাইবে, ইহা ভোলানাথের স্বপ্নের অতীত ছিল। তাহার পাপের শাস্তি এত অল্পের মধ্যে হইয়া গিয়া তাহার অন্ধকার পথের উপর এমন ভাবে যে পুণ্যের আলোক আসিয়া পড়িবে, ইহা সে আশাও করে নাই। ইহার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। মনে মনে সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। সে মনে ভাবিল, স্ত্রীর আজ্ঞাধীন হয়ে এতদিন শ্বশুরবাড়ীতে পড়িয়া থাকাটাই তাহার খুব ভুল হইয়াছে। আজ তাহার সেই বইয়ের চার ছত্র লেখাটার কথা মনে পড়িল—

'খোসামুদের চেয়ে অধম
কোথায় গেলে পাই ?
তা'র চেয়েও অধম পাবে
যে জন ঘর-জামাই।'

ভোলানাথ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, ভাগ্যে যেটুকু বিড়ম্বনা থাকে, সেটুকু মানুষকে ভোগ করিতেই হয়। রাজা রামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নল প্রভৃতি কেহই তাহা হইতে উদ্ধার পান নাই।

যোগেশ বাবুর সহিত ভোলানাথ তাঁহার বাড়ী আসিল। ভোলানাথের বেতন হইল, মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকা। যোগেশ বাবুর কলিকাতায় খান চৌদ্দ পনর ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। সেইগুলির ভাড়া আদায়, দেখা-শুনা, আর তত্ত্বাবধান করা—ইহাই ভোলানাথের কাজ। যোগেশ বাবু কহিলেন, আমি বারো মাসের মধ্যে সাড়ে এগার মাসই থাকি রাঁচি। এই সময়টা দিন পনর এসে কলকাতায় কাটিয়ে যাই। আমার এই ভবানীপুরের বাড়ীখানা তার জন্যে আটকে রাখ্‌তে হয়। আপনি এই বাড়ীতেই থাকবেন। চাকর একটা থাকে ; তাকে খাটিয়ে-খুটিয়ে নেবেন। তিনি মোটামুটি ভোলানাথকে তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। ভাড়ার টাকার সম্বন্ধে শুধু একটু বিস্তারিত করিয়া বলিয়া দিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে,

যখনই যে বাড়ীর ভাড়া আদায় হইবে, তদ্দণ্ডেই তাহা যেন [illegible] তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্বন্ধে বেশ একটু বড় ভূমিকার দ্বারা ভোলানাথকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন, এবং সুকৌশলের সহিত তাহার নিকট হইতে এমন একটু লিখাইয়া লইলেন, যাহাতে টাকা, কড়ি সম্বন্ধে কোনরূপ অবিশ্বাসের কাজ করিতে ভোলানাথের সাহস না হয়। যোগেশ বাবু ভদ্রতার সহিত কহিলেন, এ সব হল For Business sake—বুঝেছেন ত? একটা লিখে নিতে হয় তাই, নইলে—আপনার সঙ্গে ট্রেণে আলাপ করেই বুঝেছি যে, আপনার দ্বারা কোন ক্ষতিকর কাজ হবে না।

বাহিরের ঘরখানিতেই ভোলানাথের আস্তানা পড়িল ফাঁকা ঘর। দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না। বছরের মধ্যে ১৫টা দিন মাত্র এখানে কাটাইয়া যান বলিয়া আস্‌বাব-পত্র কিছুই নাই।

দুপুর বেলা ঘরখানির মধ্যে, মেজেয় পাতা একখানা সতরঞ্চির উপর বসিয়া ভোলানাথ ভাবিতেছিল, পারুলের সহিত কোন সম্পর্ক আর রাখা উচিত কি না। ধর্ম্মের দিক দিয়া, আইনের দিক দিয়া, লৌকিক আচারের দিক দিয়া—সর্ব্ব রকমে ভাবিয়া দেখিয়া অবশেষে স্থির করিল, উচিত নয়। বিবাহিতা স্ত্রী অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নী বটে, কিন্তু পয়সা-ওয়ালা পিতার কন্যা

বলিয়া ভিতর ভিতর তাহার অহঙ্কারেরও অন্ত নাই। সুতরাং তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখাই উচিত নয়। তবে আইনতঃ সে খোরপোষের দাবী করিতে পারে বটে। তাই-ই যদি করে, তাহার ৪৫ টাকা হইতে গোটা দশেক করিয়া টাকা প্রতি মাসে তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তবে ও বাড়ী কিম্বা শ্বশুরবাড়ীর ছায়াস্পর্শ সে আর করিবে না।

হঠাৎ বাহির হইতে সদরের দরজা ঠেলিয়া যোগেশ বাবু প্রবেশ করিলেন। তাহার পিছন পিছন আর একটি লোক। উভয়েই সতরঞ্চির উপর বসিলেন। যোগেশ বাবু কহিলেন, গিনির মালার আজকাল রেওয়াজ নেই। আপনি বলছেন—

লোকটি কহিল, বেশ ত; গিনির মালাটাও sir, আপনি একবার দেখিয়ে আনুন, আর এই নেকলেস্‌টাও দেখান। যদি দুটোর একটা পছন্দ হয়।

আপনাকে যা আনতে বল্লুম, তা আনলেন না।

আচ্ছা, sir, এই দুটো জিনিষ মেয়েদের একবার দেখিয়ে আনুন না আপনি।

যোগেশ বাবু বাক্‌স দু'টি লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

পনর মিনিট, বিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট যখন কাটিয়া গেল, তখন লোকটি বিচলিত হইয়া উঠিল; ভোলানাথকে কহিল

একটু খবর দিন না গিয়ে, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। ভোলানাথ কহিল, আমি ত বাড়ীর মধ্যে যাই না, সবে আমি কাল এসেছি। রামুয়া চাকর একটু আগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল : সে কহিল, কোঁউঠি যিব! এ বাসায় তো মায়েলোক নাই আছন্তি।

মেয়েলোক নেই ?—লোকটি চমকাইয়া উঠিল। এবং সঙ্গেসঙ্গেই বাড়ার মধ্যে ছুটিল। দেখিল, সত্যই তাই বটে মেয়েলোক ত নাই-ই, পুরুষটিও নাই। এমন কি, বিশেষ কোন জিনিস-পত্রও নাই। শুধু একটা ভাঙ্গা হ্যারিকেন, একটা কেরাসিন তেলের বাক্স, এক জোড়া ছেঁড়া চটি, দু'একটা এটা সেটা আর মেজের উপর যৎসামান্য একটা ময়লা বিছানা আর দেখিল, খিড়কীর দিক্ দিয়া বাহিরের রাস্তায় গিয়া পড়িবার একটি দরজা এবং সেই দরজাটি খোলা।

লোকটি আবার ছুটিয়া আসিল এবং কৌশলে বাহির হইতে বাহিরের ঘরের শিকল টানিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার লোক জমিয়া গেল। একজন বলিল, আপনি আর গিনির হার দেখাবার লোক পেলেন না? এখানে এই মাস দেড়েক এসে, আমার দোকান থেকে উঠনো খেয়েছে, কিছুতেই আর আদায় করতে পাচ্ছি নি। এক জন বলিল, সে দিন একটা আংটি রেখে যে আমার কাছ থেকে

পাঁচটা টাকা নিয়ে গেছে! এক জন বলিল, আংটি? ঘোড়ার খুর প্যাটার্ণ, ত? আরে, সে যে আমার! বল্লে, সেকরাকে প্যাটার্ণ টা একবার দেখাব। ব'লে চেয়ে নিলে। সেই থেকে দেখাই পাই না। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলে, বলে, বাবু আমতায় জমাদারীতে গেছে!

সকলের যুক্তিতে তখনই পুলিসে সংবাদ দেওয়াই স্থির হইল এবং পুলিস আসিয়া স্বয়ং বাবুকে না পাইয়া তাঁহার কলিকাতা ষ্টেটের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ভোলানাথকে এবং নূতন ভৃত্য ছোঁড়াকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল।

থানায় ইন্সপেক্টর ভোলানাথকে ধমকাইয়া কহিল, তোমার বাড়ী কোথায়?

আমার বাড়ী নেই।

কোথায় থাক?

আজ দু'দিন ঐখানে ছিলুম। ট্রেণের মধ্যে ওঁর সঙ্গে --

পূর্ব্বে থাকতে কোথায়?

আজ্ঞে, পূর্ব্বে থাকতুম শ্বশুর -

যাহা হউক, অবশেষে পুলিশ বুঝিতে পারিল যে, ভোলানাথ এবং চাকরটা নির্দ্দোষ। তিন দিন দুর্ভোগ ভুগিবার পর চতুর্থ দিনে ভোলানাথ তাহাদের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইল।

বলা বাহুল্য যে, পুলিস উভয়েরই নামধাম লিখিয়া লইল।

বাহিরে আসিয়া ভোলানাথ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উঃ।"

রামুয়া পিছনে আসিতেছিল; বলিল, সরকার বাবু কি আজি শোশুর বাটীতেই যিব ?

চোপ্ রও! পাজি, উল্লুক, র‍্যাস্কেল কাঁহেকা!

*   *   *   *

সন্ধ্যার সময় খিড়কীর দরজায় কে কড়া নাড়িতেছিল।

পারুল তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়া, প্রদীপ হাতে দরজার ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ?

আমি।

আমি কে ?

খোল না, বলছি।

মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, খিল খুলিতে খুলিতে পারুল বলিল, তুমি ? এতদিন কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলে শুনি ? তা, খিড়কী দিয়ে কেন ?

কোন কথার জবাব না দিয়া, গোঁ-ভরে ভোলানাথ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। দালানে ছোটখুকী তাহার পুতুলের খেলা করিতেছিল, সে চেঁচাইয়া উঠিল, অ মা, অ মাসীমা, কে এসেছে শীগ্‌গির দেখবে এসো!

দীনবন্ধুর মেসের দিনগুলা একটানা একরূপ কাটিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাতে বাধা পড়িল, তাহার কলিকাতার মেসে হঠাৎ একদিন তাহার মাতুলের অশুভ আগমনে। তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের স্কুল থেকে সে যখন ম্যাট্রিক দেয়, তখন তাহার বাবা তাহা দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র ছেলের পাশের খবরটা বৃদ্ধ শুনিয়া আর যাইতে পারে নাই। হঠাৎ তিনটি দিনের সময় দিয়া, পরপারের ডাক এমন কড়া তাগাদায় তাহাকে ডাক দিয়া বসিল যে, বৃদ্ধ আর ভাবিবার চিন্তিবার অবসর পাইল না,—উনিশ বৎসরের পুত্র, সাত পুরুষের ভিটা-বাড়ী, ৭॥ বিঘা ধান জমি, ২৯ টাকার পেন্‌সন—এ সমস্তের মায়া কাটাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। দীনবন্ধু তখন অকূল সংসার-সমুদ্রে পড়িল—একা। দেখিল—পুঁজি তাহার—পিতৃ-পরিত্যক্ত পুরাতন বসত-বাড়ীখানি,সাড়ে সাত বিঘা ধানজমি আর স্বকৃতলব্ধ ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেটখানি। ইহাই সম্বল করিয়া বছর দুই কাটিবার পর, তাহার মাতুল কাঙালীচরণ বাবু একবার

তাহাকে দেখিতে আসেন এবং ভাগিনেয়ের বর্ত্তমান দেখিয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উপদেশ দেন যে, সে যখন ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, তখন পড়া চালাইয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য এবং এ কর্ত্তব্য সাধন করিতে যাহা ব্যয় হইবে, তিনিই তাহা বহন করিবেন। এই সূত্রে তিনি আপন পুত্রের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার বড়ই অভিলাষ ছিল যে, মহেন্দ্র লেখাপড়া শিখিয়া গ্রাজুয়েট হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে হইল একটা গরু। তা দীনবন্ধুও পুত্রস্থানীয়, যদি তাহার দ্বারাও এ সাধ তাঁহার মিটে, তাহা হইলেও......। দীনবন্ধু মাতুলের সাধ মিটাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

কাঙালীচরণ তেমন ধনী না হইলেও নেহাৎ কাঙাল ছিলেন না। বহুকাল হইতে তাঁহার নিজের গ্রামখানি তিনি জমিদারের কাছ থেকে পত্তান লইয়া তাহা হইতে বেশ দু'পয়সা আয় করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ভাগিনেয়কে কহিলেন, তুমি কালকাতায় মেসে থেকে কোন কলেজে ভর্ত্তি হও, কলেজের বেতন ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা ক'রে আমি পাঠিয়ে দেবো। তবে মেসের খরচটা, তোমাকে দু' একটা ছেলে পড়িয়ে নিতে হবে। পারবে না? দীনবন্ধু কহিল, খুব পারব। ব্যবস্থা হইল, কাঙালীচরণ তাহাকে মাসে দশ টাকা নয়, আরও পাঁচ টাকা—অর্থাৎ পনর টাকা করিয়াই পাঠাইবেন।

তখন হইতে আজ প্রায় চারি বৎসর কাল দীনবন্ধু মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া আসিতেছে। হিসাব মত এখন তাহার 'ফোর্থ্ ইয়ার'। কিন্তু এ হিসাব—তাহার মাতুল কাঙালীচরণের কাছে; তাহার নিজের কাছে যে গোপন হিসাব আছে, তাহা কিন্তু ঐ হিসাবের সহিত একেবারেই মিলিবে না। তাহা হইতেছে এই :—গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই দীনবন্ধু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে, আর অধিক লেখা পড়া শেখার জন্য অনর্থক পয়সা ব্যয় সমীচীন নয়। মামার কাছ থেকে মাসে মাসে পনরটা ক'রে টাকা আদায় চলিতে থাকুক, তবে যে পা দুটোকে বিদ্যামন্দির থেকে বাইরে এনে ফেলেচি, তাদের পুনরায় আর তার মধ্যে নিয়ে যাব না।—এই হিসাবেই আজ কয় বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কাঙালীচরণ প্রতিমাসেই দীনবন্ধুর নামে পনরটি করিয়া টাকা মনিঅর্ডার করে। এ ছাড়া দু'একটা টিউসানিও তাহার আছে। সুতরাং দীনবন্ধুর দিন দিব্য আমোদে আহ্লাদে স্ফূর্ত্তিতে কাটিয়া যাইতেছে। মামা ভাবেন, নিজের ছেলে গ্রাজুয়েট হইতে না পারিলেও, ভগিনীর ছেলে তো হইতেছে। আর ভাগিনেয় ভাবে, পড়িবার অজুহাত্ না হইলে কি আর মামার কাছ থেকে পনরটি করিয়া টাকা দূরের কথা—পনরটি করিয়া পয়সা আদায় করা যাইতে পারিত ?

উভয়েই যখন এইরূপ ভাবনায় মগ্ন তখন হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে ভোলাচরণ ভাগিনেয়ের মেসে আসিয়া হাজির হই-লেন। আসিয়া কহিলেন, প্রথমে তোমার কলেজেই আমি গিয়েছিলুম।—সহসা মামার আবির্ভাবে দীনবন্ধু মনে মনে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর তাঁহার ঐ কথাটি শুনিয়া সে প্রমাদ গণিল। মামা কহিলেন, কলেজে বল্‌লে,—দীনবন্ধু বসু বলে কেউ 'ফোর্থ্ ইয়ারে' বা 'থার্ড্ ইয়ারে' পড়ে না। আমি অনেক করেই জিজ্ঞাসা করলুম। শেষকালে একটু বিরক্ত ভাবেই তাঁরা বললেন, ও-নামেই কলেজে কেউ নেই। দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ব'লে একজন আছে'সেকেণ্ড ইয়ারে'।—ব্যাপারটা যে, কি, সে ত আমি বুঝতেই—

মামাকে আর অধিক বলিতে না দিয়াই দীনবন্ধু বলিয়া উঠিল, ব্যাপারটা হোয়েচে কি জানেন মামা,—দেশের লোকের জ্বালায় অস্থির হোতে হোয়েছিল। সকলে নিজেদের কাজে কর্ম্মে আসবে কোলকাতায়, আর আড্ডা করবে এসে—আমার ঘাড়ে। নিত্য একজন-না-একজন দেশের অভ্যাগত—এ ছিলই। এ খরচ আমি যোগাই কোথেকে! শেষকালে এই ফন্দী করলুম।

কি?

মেসের সকলকে শিখিয়ে রাখলুম, কেউ এসে খুঁজলে, বলবে যে, দীনবন্ধু এ মেস ছেড়ে চলে গেছে। আর কলেজের প্রিন্সি-

প্যালকে সব খুলে বলে—বল্লুম যে, কেউ এসে আমার সন্ধান করলেই যেন কোন সন্ধান না দেওয়া হয়। এই ক'রে তবে এখন রেহাই পেয়েচি। দেশের লোকের জ্বালায় পড়াশুনাও কি ভাল করতে পারচুম আগে ? এখন একটু পড়বার-শোনবার সময় পাচ্চি। আপনি চা খাবেন কি মামা ?

চা ? তা একটু—

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া দীনবন্ধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একহাতে এক কাপ চা এবং অপর হাতে কিছু খাবার লইয়া মিনিট কতক পরে দীনবন্ধু যখন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল, ও-ঘরের কালীবাবুর সহিত মামা বেশ গল্প জমাইয়া ফেলিয়াছেন। আলোচনাটা বোধ হয়, দেশের আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে। কেন না, দীনবন্ধু ঘরে ঢুকিতেই কালীবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং যাইতে যাইতে মামার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, লেখাপড়াটা শিখে, লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই বেশী হচ্চে মশাই! এই যে—দীনবন্ধু পড়াশুনো ত্যাগ ক'রে বসে আছে, এক পক্ষে ও ভালই করেচে। কলেজের উদরে আর যথাসর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়ে কি ফল বলুন ? তার Returnটা পাওয়া যায় ?

দীনবন্ধুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মামা কহিলেন, দীনু, কি ব্যাপার বল ত ? তুমি কি পড়াশুনা ত্যাগ করেচ না কি ?

দীনবন্ধু একটু হাসিয়া কহিল, আমি ? আমি ত্যাগ করব পড়াশুনা ? এম.এ.টা পর্য্যন্ত ত পড়ি, তার পর ভেবে দেখবো—কি করব না-করব।

—তবে যে উনি বল্লেন……

আপনি যে তক্তপোষের ওপর ব'সে আছেন,ঐটে যার 'সিট্',তার কথা উনি বল্লেন। সে ছেলেটিরও নাম—দিনবন্ধু। আমার নাম—দয়ে 'দীর্ঘ ঈ' কার,তার নাম গেচে—দয়ে 'হ্রস্ব ই' কার। তার মানে—সূর্য্য। ছেলেটি পড়াশুনো ছেড়ে একটা ব্যবসাতে ঢুকেচে।—আপনি কি আজকেই বাড়ী ফিরবেন মামা ?

নিশ্চয়ই। ৬টা একুশের ট্রেণে আমায় ফিরতেই হবে।

৬টা ২১ বোধ হয় আর নেই। শুনচি, এই হপ্তা থেকে ওটা বদলে গিয়ে না কি ৫টা ২৪ হোয়েচে।

তাই না কি ? তা হোলে ত আর দেরী—

আজ মামা, থেকে গেলে হোত না ? আমি ঠাকুরকে একটু ভাল মাংস কিনে আনবার জন্যে বলে দিয়ে এলুম।

কিন্তু থাকিবার উপায় নাই। বাড়ীতে মামার নিজের দরকারী কাজ। সুতরাং তাড়াতাড়ি তিনি জলখাবার ও চা খাইয়া

উঠিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহের মোড় পর্য্যন্ত আসিল।

দিন চারি পাঁচ পরে মামার নিকট হইতে দীনবন্ধু এক পত্র পাইল। তাহাতে মামা লিখিয়াছেন,—পরম কল্যাণীয় দীনবন্ধু, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি অতি উচ্চদরের গ্রাজুয়েট্ হইয়া গিয়াছ ; সুতরাং আর আমাকে মাসে মাসে পনের টাকা করিয়া তোমায় পাঠাইবার আবশ্যক হইবে না ; এখন তুমি নিজেই তোমার খরচ চালাইতে সক্ষম হইবে। ইতি।

কয়দিন হইতেই দীনবন্ধুর মনটা উৎকণ্ঠিত ছিল। এক্ষণে মামার পত্র পাইয়া সব উৎকণ্ঠার শেষ হইল। নিজের মনের মধ্যে সে তাল ঠুকিয়া বলিল, কুচ্ পরোয়া নেই, উঠে-পড়ে লেগে একটা চাকরীর যোগাড় করতে হবে।

কিন্তু প্রায় দুই মাস ধরিয়া চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও দীনবন্ধু কোন স্থানে কোন চাকুরীর যোগাড় করিতে পারিল না টুইসান করিয়া যে কয়টি টাকা পায়, তাহাতে তাহার মেসের খরচই কুলায় না। সুতরাং দীনবন্ধু বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় পাঁচ সাত দিন ধরিয়া সে নানারূপ চিন্তার পর ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, দেশে গিয়া থাকাই ভাল। তবে দেশে গিয়া থাকিতে হইলে, ৭॥ বিঘা ধানজমিতে কিছু হইবে না। অন্ততঃ পক্ষে বিঘে পঁচিশ জমির দরকার। দীনবন্ধু মনে মনে হিসাব

করিল, হাজার—বারোশ' টাকা কোন রকমে যোগাড় করে ফেলতে পারলে, দেশে গিয়ে বেশ সুখে থাকা যায়। আরো ২০ বিঘে ধান জমি ৪০৲ টাকা হিসাবে ৮০০৲ টাকা, বাড়ীটা অল্প-স্বল্প মেরামত করাতে শ' খানেক, এক জোড়া হেলে গরু, একটা গাই, আর দু'একশ নগদ পুঁজি। অর্থাৎ বারো শ হলেই ভাল হয়। একটা টানা নিশ্বাস ফেলিয়া দীনবন্ধু নিজের মনে বলিয়া উঠিল, যাঁহা ছাপ্পান্ন—তাঁহা আটষট্টি! কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—দেখা যাক!

২

দীনবন্ধু মেসেই থাকে এবং সকালে সন্ধ্যায় টিউসানি করে; সুতরাং তাহা হইতে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আয় আছে। তাহা ভিন্ন দু চারটি অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব আছে এবং এদিক-সেদিকও আছে। সব লইয়া কোন প্রকারে তাহার মেসের খরচ চলিয়া যায়। খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন সে রোজই দেখিয়া যায়। দেশে বাস করিবার জন্য বারো শ' টাকা যে পর্য্যন্ত না যোগাড় হয়, তার মধ্যে সুবিধামত যদি কোন চাকুরী লাগিয়া যায়, তাহা হইলে তা আর সে ছাড়িবে না। দু'এক স্থানে দরখাস্তও দিয়াছে, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই।

সেদিন একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি তাহার বিশেষ করিয়া নজর পড়িল। উহা সে বার বার পাঠ করিল এবং তৎসম্বন্ধে নানা-রূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

বিজ্ঞাপনটি এই—

'একটী কিশোরী কন্যাকে ম্যাট্রিক-ফোর্থ ক্লাসের ষ্টান্‌ডার্ড গৃহে পড়াইবার জন্য একটি গ্রাজুয়েট্ গৃহ-শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষকের বয়স ২৫।২৬ এর বেশী না হয়। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সুন্দর ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হওয়া চাই। ল-ষ্টুডেণ্ট হইলে ভাল হয়। বেতন—আহার, থাকিবার স্থান, ধোবা, নাপিত, চা, জলখাবার এবং নগদ ৭৷৷০ টাকা। বক্স নং'A F. ৩০৫।'

দীনবন্ধু ভাবিল, লোকটা মেয়ের জন্যে মাষ্টার চায়—না—বর চায়? বরই চায়। সর্ব্বরকমে একটি সুপাত্র হস্তগত করতে চায়—খুব অল্প খরচে। অর্থাৎ সস্তায় কিস্তিমাত্ করবার মৎলব। বয়স ২৫।২৬ হওয়া চাই, চেহারা সুন্দর আর স্বাস্থ্য-পূর্ণ হবে। তার ওপর—ল-ষ্টুডেণ্ট হলেই ভাল হয়, তার মানে, নিজের হয়তো মামলা মোকদ্দমা একটু বেশী হয়, উকীল জামাইকে দিয়ে 'বেয়ারিং পোষ্টে' সেগুলো সারবেন। লোকটার আশার আর অন্ত নেই! তবে এর ভেতর মজা হচ্চে—ঐ সাড়ে সাত টাকা! নগদ দেবেন তিনি—৭ টাকাও নয়, ৮ টাকাও নয়—৭৷৷০ টাকা। এ রহস্য ভেদ করা কঠিন ব্যাপার।—খানিকক্ষণ

একটু ভাবিয়া দীনবন্ধু আপনার মনে বলিল, কঠিন কিছু নয়—জানে যে, নিজের পকেট থেকে এক পয়সাও দেবার দরকার হবে না, ঐ মাষ্টারই উল্টে তার নিজের পকেট থেকে দিয়ে যাবে। আর নেহাৎ-ই প্রথম প্রথম যদি দিতে হয় ত, রোজ এক সিকি ক'রে ৩০ দিনে ৩০ সিকি অর্থাৎ ৭৷৷০ টাকা না হয় দেওয়া যাবে। তাই ঐ ৭৷৷০ টাকার ব্যবস্থা। বিবেচক লোক! চা, জলখাবার বাদে কিশোরীটিকে নিয়ে মাসে অন্তত দু'বার বায়োস্কোপে যেতে হবে। তারির খরচটা আর কি! যাই হোক, কিশোরীটিকে এবং তস্য পিতাটিকে একবার ত দেখে আসতেই হবে। কিন্তু ঠিকানা? ঠিকানা যোগাড় করে ফেলবোই। আপাততঃ Box নম্বরে এক দরখাস্ত পেশ করে দেওয়া যাক ত।

পরদিনই দীনবন্ধু Box No A. F. ৩০৫-এ এক দরখাস্ত পাঠাইল। দরখাস্তে লিখিয়াছিল—বয়স আমার ২৫ এর মধ্যেই। আমি গ্রাজুয়েট, ল-ক্লাসে ভর্ত্তি হইব। অনুমতি পাইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দিত হইব। তখন চেহারা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিবেন। আমি বিদেশী। নগদ টাকার আমার প্রয়োজন না হইতে পারে। কেবল মাত্র একটু আশ্রয় ও আদরপ্রার্থী। দরখাস্তের নীচে নাম দিয়াছিল—দীনবন্ধু মৈত্র। একগাছি পৈতা তাহাকে গলায় ঝুলাইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়া পড়িল,—'আপনি যে-কোন দিন প্রাতে, ১৭নং শ্যামদাঁদ গোস্বামী লেনে আসিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ খুসী হইবেন।—সুতরাং কাল-বিলম্ব না করিয়া তৎপর দিনই প্রাতে দীনবন্ধু 'নিম্ন স্বাক্ষরকারীর' সহিত সাক্ষাৎ করিল। দীনবন্ধুর শক্তিশালী, সুঠাম চেহারা দেখিয়া ও তাহার সহিত নানাপ্রকার আলাপ-পরিচয় করিয়া, নিম্ন স্বাক্ষরকারী' সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং পরদিন হইতেই দীনবন্ধুকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কন্যা শ্রীমতী বসন্তলতাকে ডাকিয়া বলিলেন, ইঁনিই তোমার মাষ্টার। মন দিয়ে এঁর কাছে পড়া-শুনা করবে। এঁর ঘরটা আজকের ভেতরই গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখো, কাল সকালেই উঁনি আসবেন।

দীনবন্ধু দেখিল, ছাত্রীটির রূপ না থাকিলেও, তাহার সাজ-গোজ, হাব-ভাব এবং কথা কহিবার কায়দার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। মনে মনে ভাবিল, দেখাই যাক, ব্যাপারটা অবশেষে কি দাঁড়ায়। সে পরদিন হইতেই তাহার গুরুগিরি সুরু করিয়া দিল।

দিনকতক থাকিবার পরই দীনবন্ধু বুঝিতে পারিল, তাহার অনুমানই ঠিক। বসন্তলতাটিকে কোন একটি উদ্যান-তরুর অঙ্গে জড়াইয়া দিবার মতলবই বটে। যাহাই হউক, সে

ঐকান্তিক মনে তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল। ছাত্রীটিও তাহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সে না ডাকিতেই আসে এবং যাইতে বলিলেও যাইতে চাহে না। এখানে আসিবার আগে দীনবন্ধুর একটা দুর্ভাবনা হইয়াছিল যে, ম্যাট্রিক পাশের বিদ্যার জোরে সে বসন্তলতাকে চালাইয়া লইতে পারিবে কি না। কিন্তু সে দুর্ভাবনা তাহার কাটিয়া গেল। বসন্তকে লইয়া আয়োজনটা যে ওজনের ছিল, কাজে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা এবং শিক্ষাদান সহজ ভাবেই চলিতে লাগিল।

পড়িতে বসিয়া বসন্ত জিজ্ঞাসা করে, 'দেবদাসে' পারুলের কি কষ্ট বলুন! দীনবন্ধু বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা, দেবদাসের জন্যে আপনার খুব কষ্ট হয়?

তা হয় না আবার!

মধ্যে মধ্যে অভিভাবকটি আসিয়া বসেন। তাঁহার নাম সুখেন্দু সান্ন্যাল। সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্ক-টঙ্কগুলো পারে ত? দীনবন্ধু বলে, অঙ্কেই ওর মাথা ভাল। দেখবেন? আচ্ছা বল ত বসন্ত, একখানা বাঁশের অর্দ্ধেকটা লাল, ৳ কাল, বাকী সাদা অংশটা——

প্রশ্নের দিকে মনোযোগ না দিয়া বসন্ত দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উৎফুল্লভাবে বলে, আমি practice শিখে গেছি, বাবা।

বাবা কহেন, বেশ—বেশ, মন দিয়ে সব শিখে নাও। তার পর তিনি উঠিয়া গেলে, দেওয়ালের ছবিখানা দেখিয়া, দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, Cupid অন্ধ কেন?

Cupid প্রেমে অন্ধ। সত্যিকার প্রেম যেখানে, সেখানে চোখ অন্ধ ক'রে দেয় বসন্ত; সে-চোখে ভাই-বোনের সম্বন্ধ, শিক্ষক-ছাত্রীর সম্বন্ধ—এ সব নজরে পড়ে না।

এই ভাবে গভীর মনোযোগের সহিত দুইটি মাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিল। তাহার পর একদিন রাত্রে আহারাদির পর সুখেন্দু তোড়-জোড় করিয়া দীনবন্ধুর কাছে আসিয়া বসিলেন এবং ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে দুই চারিটা অন্য কথার পর বলিলেন, দেখ দীনবন্ধু,—

আজ্ঞে।

বসন্ত সম্বন্ধে তুমি কিছু লক্ষ্য করেচ কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ নতুন ঝিটার সঙ্গে ভারি বকা-বকি করে।

আহা-হা! সে সব নয়। আমি বলি; তুমি একটু মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনে যাও।—বলিয়া সুখেন্দু বাবু ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, সাজাইয়া-গুছাইয়া, বুঝাইয়া, দীনবন্ধুকে যাহা বলিলেন,—তাহার মর্ম্ম এই, যে—বসন্ত বড় হইয়াছে, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে এবং হঠাৎ সে দীনবন্ধুকে ভালবাসিয়া

ফেলিয়াছে। এ-কালের উন্নত প্রণালীর নিয়মে, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহের ভিতর দিয়া উভয়ের মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে অন্যান্য সমস্ত দিকই অনুকূল, তবে দীনবন্ধুর পিতা হয়ত প্রতিকূল হইতে পারেন। সুখেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বাপ-মাকে না জানিয়ে এ কাজে রাজী আছ ? রাজী হোলে, বুঝবো--তুমি ভাগ্যবান। বসন্ত আমার—সদা-সবুজ, লীলা-চঞ্চল, অনিন্দনীয় বসন্তলতা ! বেশ ক'রে বুঝে দেখ বাবাজী !

দীনবন্ধু যা অনুমান করিয়াছিল, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলিয়া গেল। সে লজ্জার ভাণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই সব বাপ কি ক'রে এমনটা পারে ? একটা অ-জানা, অ-চেনা লোকের সঙ্গে দুটো মাসের পরিচয় ; সেই পরিচয় টুকুর জোরেই—তা মিথ্যাই হোক আর সত্যিই হোক—নিজের মেয়েকে তার হাতে সঁপে দিতে ব্যস্ত !

দীনবন্ধুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সুখেন্দু কহিলেন, বুঝেছি বাবাজী, যখন মৌন হোয়ে আছ, তখন বুঝতে আর আমার বাকী নেই। তা হোলে তোমার বাবাকে দেশে আর খবর দিয়ে দরকার নেই ; তিনি মত না-ও করতে পারেন। বিয়ের পরেই বেয়াইমশায়কে জানালে হবে'খন। বলি, মান্ধাতার

আমল ত আর নেই, আজকালকার দিনে এ রকম ব্যবস্থা হোয়েই থাকে।

পাশের বৈঠকখানা-ঘরের ঘড়িতে যখন ঠং ঠং করিয়া অনেক-গুলা বাজিয়া গেল, তখন সুখেন্দুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বারোটা বাজলো। এইবার শুয়ে পড় বাবাজী। তা হোলে এ-মাসটা যাক, শ্রাবণের গোড়াতেই যে ভাল দিন আছে, সেই দিনেই...! আচ্ছা, সে হবে'খন, তুমি এখন শুয়ে পড়।

সার্থক শর-ক্ষেপে শিকারীর যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দে সুখেন্দুর অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৩

সুখেন্দু দীনবন্ধুকে বলিয়াছে যে, বিয়েতে টাকাকড়ি ব্যয় করিবার মত বর্ত্তমানে তাহার সঙ্গতি নাই, তবে ভগবান যদি দিন দেন, ত ভবিষ্যতে কন্যা-জামাতাকে তিনি অনেক কিছুই দিয়া যাইতে পারিবেন। এক্ষণে শুধু বসন্তর গায়ে পাঁচ সাত শ টাকার গহনা ছাড়া তিনি আর কিছু দিতে পারিবেন না। ইহার জন্য দীনবন্ধু যেন মনে কোনরূপ দুঃখ বা অভিমান না করে।

দীনবন্ধু বিনয় সহকারে জানাইয়াছে, সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত হোতে হবে না। আপনার যেমন সামর্থ্য এবং ইচ্ছা, সেইরূপই করিবেন।

শ্রাবণ মাস পড়িতেই সুখেন্দু একদিন দীনবন্ধুকে কহিলেন, দেখ, বসন্তর গহনা তোমরা দু'জনে পছন্দমত অর্ডার দিয়ে এস। বোধ হয় কিছু বায়না দিতে হবে। গোটা পঞ্চাশ টাকা বায়না সঙ্গে নিয়ে যাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের ইচ্ছামত দোকানেই অর্ডার দাও গে, ২০ ভরির মধ্যে যেন হয়; আর সাত দিনের মাথায় যেন জিনিষগুলি পাওয়া যায়। পাকা ক'রে তার একটা রসিদ নেবে।

অপরাহ্লে রৌদ্র পড়িয়া আসিলে, দীনবন্ধু শ্বশুরের নিকট হইতে বায়নার পঞ্চাশটা টাকা এবং বসন্তলতা,এই উভয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক বড় জুয়েলারী দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইল। সেখানে পৌঁছিয়া উভয়ে ক্যাটালগের ডিজাইন্ দেখিয়া দেখিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে পছন্দের কাজ শেষ হইল। ১০ ভরির ১০ গাছা চুড়ি, ৬ ভরির আরমলেট এবং ৫ ভরির হার—মোট ২১ ভরি। এইতেই মজুরী ধরিয়া প্রায় আটশত টাকা পড়িয়া যাইবে। তাহার পর কানের দুল আছে, হাতের আংটী আছে। দীনবন্ধু হাসিতে হাসিতে মৃদুকণ্ঠে বসন্তর কাণে হাত দিয়া বলিল, এ কাণে

ঝুম্‌কো-জবার দুল্‌ দুলিয়ে দিলেই সোনার দুলের ছেয়ে মানাবে।

বিরক্তির ভাণ দেখাইয়া বসন্ত কহিল, আঃ! যা-আ-ন্‌!

সন্ধ্যার পর সুখেন্দু জুয়েলারের রসিদখানা দীনবন্ধুর হাত হইতে লইয়া কহিলেন, এই তিনটে জিনিষেই দেখছি ২১ ভরি হোয়ে গেল। তারপর ধর, আংটী আর দুলে আরো গোটা ৫০ টাকা। তা' হোলেই আট শ' আন্দাজ প'ড়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম', শ' সাতেকের মধ্যেই কাজ সারব। এক শ' বেশী গেল। যা'ক, তার আর কি হবে!

বসন্ত কহিল, তবু আমার হাত-ঘড়ি হোয়ে উঠল না বাবা!

সুখেন্দু কহিলেন, হ্যাঁরে, সবই বাবাকে দিতে হবে? যার হাতে তোকে দিচ্ছি, সে তোর সাধ মেটাবে। কিছু বাকী রাখবে না।

আর সাইকেল?

সাইকেল পরে ও-ই তোমায় একটা কিনে দেবে। দিও ত দীনবন্ধু, এরপর ওকে একটা লেডিজ সাইকেল্‌ কিনে; বড্ড সখ ওর।

সাতদিন পরে যে দিন গহনাগুলি আনিতে হইবে, সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর, সুখেন্দু দীনবন্ধুকে ডাকিয়া সাড়ে সাত শ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, আর খানিক পরে দু'জনেই চলে যাও; গিয়ে ওগুলো নিয়ে এস।

বসন্তর আর দেরী সহ্য হয় না। তখনই দীনবন্ধুকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, গহনা প্রস্তুত। গহনাগুলি বসন্ত ও দীন-বন্ধুর খুবই পছন্দ হইল। দীনবন্ধু টাকা দিতে গিয়া বসন্তকে কহিল, রসিদখানা আনো নি ?

বাঃ, সে ত আপনার কাছে।

আমি বিছানার ওপর ফেলে এসেচি। তুমি বোসো। আমি যাব আর আসব। 'বাস্'-এ পাঁচ আর পাঁচ—দশ মিনিট।—বলিয়াই দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং সামনেই শ্যাম-বাজার গামী যে 'বাস্' খানা যাইতেছিল, তাহাতে উঠিয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে সুখেন্দুবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়েই গালে হাত দিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ অবস্থার পর স্ত্রী কহিলেন, তুমি একটি খাঁটি আহাম্মোক! একটা লোককে চিনতেই দু'এক বছর যায়, আর তুমি দু'মাসের মধ্যেই এমন ঢলে পড়লে যে—

'কাটার উপর নুণের ছিটার' মত গৃহিণীর এই শ্লেষ-বাক্যে সুখেন্দু মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তা তুমি ত ঘরে একজন চতুর-চূড়ামণি রয়েছ; খাঁটি আহাম্মোককে সাবধান ক'রে দিলেই পারতে!

বলি, রাগচো কেন? আট আটটি শো টাকা এই বাজারে

ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল ত ? ঐ রকম ক'রে কি মেয়ের বিয়ের জোগাড় করে। কথায় বলে যে,—

'অতি-বড় রূপসী না পায় বর,
অতি-বড় ঘরণী না পায় ঘর।

তা তোমারও তাই। অতি চালাকী করতে গেছলে যেমন, তেমনি ঠিক হোয়েচে! মেয়ের বিয়ে দেবে,—ঘটক লাগাও, ঘটকী লাগাও, পাঁচ জনের কাছে সন্ধান-খবর নাও; তা নয়, খবরের কাগজে মাষ্টার চাই বোলে বিজ্ঞাপন দিয়ে—মেয়ের বর খোঁজা! ঠিকই হোয়েচে। মাষ্টার এসে মেয়ের বদলে মেয়ের বাপকে এমন পড়া পড়িয়ে গেল, যে চিরদিন তা মনে থাকবে! তা তার ঠিকানাটা জানো না ? ডেকে এনে গুরু-দক্ষিণাটা দিয়ে দাও। সেই যে ঠিকানায় তাকে চিঠি দিয়েছিলে, সেখানে একবার খবরটা নাও।

ম্লান মুখে সুখেন্দু কহিল, আজ ভোরে উঠেই সেখানে গিয়েছিলুম। সেটা হচ্চে একটা মেস্। তারা কোন সন্ধান বলতে পারলে না। সেখান থেকে কাটান্-ছাড়ান্ করেই এখানে এসে ঢুকেছিল।

সেখানে তার জিনিষ-পত্তর কিছু নেই ? তার দেশ কোথা, সে সন্ধানটাও নিতে পারলে না ?

দেশ তার যমের বাড়ী!—বলিয়া সুখেন্দু রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

এখানে তিনি যখন উঠিয়া গেলেন,তখন দক্ষিণ কলিকাতার কোন একটি মেসের একখানি ঘরের মধ্যে দীনবন্ধু তাহার শয্যার উপর আসন-পিঁড়ী হইয়া বসিয়া ঘন ঘন হাঁটু নাড়িতে নাড়িতে, গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল। সুখেন্দু বাবুর বাটীতে কাজে লাগিবার সময়, সে তাহার সাবেক মেস হইতে তাহার জিনিষপত্র লইয়া এইখানে সিট্ ভাড়া করিয়া রাখিয়া যায়। সেখানে বলিয়া আসে, সে দেশে যাইতেছে। তাহার দেশ—হুগলী জেলায়, ইহাই মাত্র সকলের জানা ছিল।

খানিকক্ষণ গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিবার পর, দীনবন্ধু আলস্যভরে অঙ্গ-মোড় [illegible] া বলিয়া উঠিল, জয় দুর্গা! আর দু'টো মাস বাদেই তুমি বাঙালা দেশে আসবে মা। এর ভেতর আমার বারো শ'র বাকীটাও এই রকম দয়া ক'রে জুটিয়ে দিও জননী। যেন, দেশের বারোয়ারী দুর্গোৎসবে এবার নাচতে নাচতে তোমার সেবা করতে পারি।

৪

ভাদ্রের গোড়ায় একদিন সকাল বেলা হন্-হন্ করিয়া দীনবন্ধু কালীঘাটের মুখার্জিপাড়া লেন দিয়া আসিতে আসিতে, একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল। মুক্ত দ্বারপথে দেখিল যে, বহির্বাটীর একস্থানে দাঁড়াইয়া, গৃহকর্ত্তা ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার সামনের পাঁচীলের গায়ে কয়েকটা অশথ গাছ জন্মিয়াছে। সেইগুলি তুলিয়া ফেলিবার জন্য একজন ভৃত্য দেওয়ালের গায়ে মই লাগাইয়া তাহার উপর উঠিয়াছে, কিন্তু গাছগুলির নাগাল পাইতেছে না। ভৃত্যটি এ জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে অথচ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না দেখিয়া, গৃহকর্ত্তা ঊর্দ্ধমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বকা-বকি করিতেছেন। ভৃত্যের এই অবস্থা দেখিয়া দীনবন্ধুর অন্তর কাতর হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে পাঁচীল, অশথ গাছ, মই এবং ভৃত্য রামকানাইয়ের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিল এবং তৎপরে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি নেমে এস—তোমার কর্ম্ম নয়। কর্ত্তা নিবারণ বাবু কহিলেন, বেটা অকম্মার ধাড়ী মশাই, কোন কাজের নয়! নেবে আয়—নেবে আয়।—রামকানাই নামিয়া আসিল। তখন জুতাটা একধারে

খুলিয়া রাখিয়া, মালকোঁচা বাঁধিয়া, দীনবন্ধু তাহার দীনবন্ধু নাম সার্থক করিতে, অশথগাছ বিনাশ ব্যাপারে অগ্রসর হইল। কয়েক বৎসর আগে, দেশের জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় যেমন করিয়া সে 'ল্যাডারে' উঠিত, সেইভাবে তড়-তড় করিয়া সে মই বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং অপূর্ব্ব কৌশলে অশথ-চারাগুলির মূলোৎপাটন করিয়া সেগুলির কতক রামকানাইয়ের গায়ে, কতক নিবারণবাবুর মস্তকে অনবধান বশতঃ নিক্ষেপ করিল। তারপর সহসা, কোথা হইতে কি হইল।—কেমন করিয়া হইল—কেন হইল—সে সব আর কাহারো ভাবিবার অবসর হইল না—কিন্তু হইল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল! দীনবন্ধু মই শুদ্ধ উপর হইতে নীচে সশব্দে পড়িয়া গেল এবং পড়িয়াই অজ্ঞান! নিবারণ বাবু হায় হায় করিয়া উঠিলেন, রামকানাই আঁৎকাইয়া উঠিল, ভিতর হইতে নিবারণ বাবুর বৃদ্ধা জননী, ছেলেরা, বামুন ঠাকুর ছুটিয়া আসিল। নিবারণ বাবু দীনবন্ধুর জামার বোতাম খুলিয়া বুকে হাত দিয়া রহিলেন, বামুন ঠাকুর ঘটী করিয়া মাথায় অল্প অল্প জল ঢালিতে লাগিল, রামকানাই জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতে আর জ্ঞান হয় না। নিবারণ বাবু অতি মাত্রায় ভীত, চিন্তিত এবং ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রামকানাইকে বলিলেন, শীগগীর্ গিয়ে প্রভাস

ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। রামকানাই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রভাস ডাক্তার যখন আসিয়া হাজির হইল, তখন দীনবন্ধুর জ্ঞান হইয়াছে। বৈঠকখানার ফরাসের উপর তাহাকে শোয়ানো হইয়াছে। প্রভাস ডাক্তার তাহার বুকে ষ্টেথেস্‌কোপ বসাইয়া, নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, Too weak! পাঁজরার হাড়ে বোধ হচ্ছে যেন আঘাতটা বেশী লেগেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তুই রকম প্রেসক্রুপসন লিখিয়া কহিলেন, এক নম্বরটা তু'ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে যাবেন আর তু'নম্বরটা একটা মালিস থাকলো; বেশ ক'রে বুকে পাঁজরে ওটা মালিস্ করতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান! দিন পাঁচ-সাত বেশী ওঠা-উঠি করতে দেবেন না।

কি হইতে কি হইয়া পড়িল। নিবারণবাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন। দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাসা কোথায়? একটা সংবাদ দেওয়ার ত দরকার। দীনবন্ধু কহিল, উল্টাডিঙ্গির এক মেসে থাকি; মেদ্‌নীপুর জেলায় বাড়ী, সেইখানেই 'ফ্যামিলী' থাকে; গঙ্গাস্নানে ও কালীদর্শনের অভিপ্রায়ে এদিকে আজ এসেছিলাম।

কোলকাতায় তা হোলে কেউ নেই! যাক্, তা হোলে এখন এইখানেই—অর্থাৎ যত দিন না ভাল ক'রে—

সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ ভালরূপে আরোগ্য না

হওয়া পর্য্যন্ত দীনবন্ধুকে নিবারণ বাবুর বাড়াতেই থাকিতে হইল।

নিবারণ বাবুর শিয়ালদ'য় কন্‌ট্রাক্‌টারী কারবার ছিল—চক্রবর্ত্তী, রক্ষিত এণ্ড কোং। অফিসের বেলা হইয়া গিয়াছিল। দীনবন্ধুর জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া অফিস যাত্রা করিলেন।

দিন তিন-চার কাটিয়া গেল। ঔষধ সেবনে এবং মালিসে দীনবন্ধু অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। মালিসটার জন্য না হউক, কিন্তু সেবনের ঔষধটা খাইতে গিয়া তাহাকে একটু ভাবিতে হইয়াছিল। ভাবনা এই যে, শুধু শুধু ওষুধ গিলিয়া, শেষে হিতে বিপরীত না ঘটে বসে। মালিস—ওটা ত বাইরের কাজ; পাঁজরায়, বুকে মাখালে আর কি এমন ক্ষতি হ'বে। কিন্তু অ-দরকারী একটা ওষুধ গলাধঃকরণ—! শেষকালে ভাবিল, বিষ ত আর নয়; কি আর এমন হাতী-ঘোড়া হ'বে। সুতরাং নির্ভাবনায় এবং নির্ব্বিকারে সে প্রভাস ডাক্তারের বারো দাগ ওষুধ তিন দিনের মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং মালিসের কৌটার অর্দ্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে দিন সকাল বেলা নিবারণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া দীনবন্ধুর সহিত তাহার দেশের সম্বন্ধে গল্প-গাছা করিতেছিলেন এবং ও দিকে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার ছোট ছেলেটি স্কুলের পড়া

মুখস্থ করিতেছিল—'Why is she so sad ?' কেন হন তিনি এরূপ দুঃখিত ? দানবন্ধু শুইয়া শুইয়া খোকার উদ্দেশ্যে কহিল, 'কেন হ'ন তিনি এরূপ দুঃখিত'—এভাবে না বোলে, বলবে, তিনি কেন এত দুঃখিত হোয়েচেন ? বুঝতে পেরেচ ? তোমার মাকে কি তুমি—oh sorry !—তোমার ঠাকুমাকে, কি বামুন ঠাকুরকে তুমি কি বল, যে, দাও শীগগীর আমাকে খেতে ভাত ? নিশ্চয়ই তা বল না ; বল যে, শীগগীর আমাকে ভাত খেতে দাও। কেমন না ?

নিবারণ বাবু কহিলেন, আজকালকার যেমন সব মাষ্টার হোয়েচে ! ছেলেদের কি আর ভাল ক'রে কিছু বুঝিয়ে টুঝিয়ে দেয় ? এসেই খালি ঘন ঘন ঘড়ার দিকে দৃষ্টি আর মাসটি যেতে না যেতে মাইনের জন্যে তাগাদা ! স্কুলও সব হোয়েচে তেমনি ! ছেলেদের যে একটু ভাল ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া, সে সব পাঠ উঠে গেছে।

খোকা তখন পড়িতেছিল—Go to bed মানে—বিছানাতে যাও।

দীনবন্ধু বলিল, বিছানাতে যাও না বোলে, বল—শুতে যাও। আচ্ছা, Bed মানে হোল বিছানা, Bid মানে কি রাজু ?

আজ্ঞা কর।

Bud মানে ?

ফুলের কুঁড়ি।

বেশ ! আর Bad মানে ?

রাজু কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া হিসাব করিতে লাগিল : দীনবন্ধু কহিল Bad মানে মন্দ, দুষ্ট। He is a bad lad—সে হয় একটি মন্দ বালক।

নিবারণবাবু কহিলেন, একটা কথা তোমায় বলব, দীনবন্ধু ?

দীনবন্ধু কহিল, বলুন।

তুমি বল্‌ছিলে, কোথাও থাওয়া থাকায় একটা টিউসনি পেলে, কর। আমি বলচি কি,আমার এখানে থেকে যদি রাজুকে সকালে-সন্ধ্যায় একটু একটু—তোমার আপত্তি আছে কি ? তোমার কাছে রাজু পড়লে, ওর কিছু হবে ; নইলে, আজকালকার পেশাদারী মাষ্টারের কাছে—ওর কিছু হবে না। তা, কি বল তুমি ?

দীনবন্ধু কহিল, আমার কোন অমত নেই , বরং তাতে আমারই খুব সুবিধে হবে। প্রাণটাকে আপনি বাঁচিয়েছেন, আপনিই তা হ'লে তা জীইয়ে রাখবেন।

ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। দীনবন্ধু নিবারণ বাবুরই বাড়ীতে থাকিবে, থাইবে এবং রাজুকে পড়াইবে। নিবারণ বাবু দীনবন্ধুকে কহিলেন, দেখ—আমার স্ত্রী নেই, ঐ বুড়ী মা আর

ছেলে দুটি। বড় ছেলেটি তার পড়া-শোনাতেই ব্যস্ত, আমি সমস্ত দিন বাইরে আফিসের কাজে, ঠাকুর চাকরের ওপরই সব নির্ভর। সেইজন্যে বলে রাখি, নিজের বাড়ী মনে করেই সব দেখে শুনে নেবে।

তারপর আনন্দে দীনবন্ধুর মুখে আর কথা যোগাইল

৫

একমাসের থাকা এবং মেলা-মেশাতে দীনবন্ধু নিবারণ বাবুর সংসারে ঘনিষ্ঠ পরিজন মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে। নিবারণ বাবু তাহাকে সহোদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার প্রীতি ও স্নেহে, বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব-স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুখেন্দুবাবুর গৃহে যাইবার পূর্ব্বে তাহার যে সমস্ত উদ্দেশ্য ছিল, হয়তো এখন সে সকল তাহার মনের মধ্যে মৃত হইয়া একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

প্রভাতে চা-পান করিয়া নিবারণবাবু পাড়ার মধ্যে কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া, বৈঠকখানায়

প্রবেশ করিলেন। তাঁর বড় ছেলে নন্দ তখন দীনবন্ধুর কাছে বসিয়াছিল। নন্দর হাতে ছোট একটি পুঁটুলা দিয়া তিনি কহিলেন, ঠাকুমাকে দাও গে, নন্দ। বল—যে অক্ষয় ঘোষ আজ এই তিন শ' টাকা দিয়েচে, বাকীটার জন্যে পূজোর পর সময় নিয়েচে।

—বলিয়া তিনি দীনবন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে বসিলেন।

ঘণ্টা দুই পরে, নন্দ কলেজে ও রাজু স্কুলে চলিয়া গেল। আরও কিছু পরে নিবারণবাবু আফিসে বাহির হইয়া গেলেন। দীনবন্ধু তখন আহারাদি করিয়া একখানা বাংলা নভেল লইয়া তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেলা যখন একটা, তখন সে বইখানা রাখিয়া দিয়া, বাটীর মধ্যে গিয়া, নিবারণবাবুর বৃদ্ধা মাতাকে কহিল, মাসিমা, দাদা টেলিফোনে আপনাকে ডাকচেন, একবার বাইরের ঘরে আসুন। বৃদ্ধা বৈঠকখানায় আসিয়া কহিল, কি বল্‌চে নিবারণ?

কি জানি, আপনি শুনুন। এইটে কাণে ধরুন।—বলিয়া রিসিভারটা তাঁহার হাতে দিল। তিনি খানিকক্ষণ তাহা কাণে রাখিবার পর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, না বাপু, আমি কিছুই শুন্‌তে পাচ্চি না। ও কল্‌-টল্‌ কাণে দোয়া আমার অভ্যেস নেই। তুমিই বাবা শোন; শুনে আমায় বল।

তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। দীনবন্ধু কথা কহিতে লাগিল।

দাদা! মাসি-মা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।—তিনি কানে দিয়ে কিছু শুনতে পেলেন না—টেলিফোনে কথা কওয়া ত ওঁর অভ্যাস নেই।.........হাঁ...বুঝতে পেরেচি। অক্ষয় ঘোষ? ...তার দরুণ তিন শ টাকা?...না আমি সুমুই নি, একখানা বই পড়ছিলুম...না. আমা দেরী করব না। মাসি-মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এখনি আপনাকে অফিসে গিয়ে দিয়ে আসচি...না. না. মোটে দেরী করব না।...আচ্ছা।

রিসিভার রাখিয়া দিয়া, দীনবন্ধু মাসীমাকে সব বুঝাইয়া বলিল। তিনি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিবারণ বাবু সকাল বেলাকার অক্ষয় ঘোষের দরুণ সেই তিন শ' টাকা, হঠাৎ কি দরকারে টেলিফোন করিয়া চাহিতেছেন। দীনবন্ধুকে সেই তিন শ' টাকার নোটের ছোট পুঁটুলিটা তিনি আনিয়া দিলেন।

*　　*　　*　　*

তাহার পর দিন কতক কাটিয়া গিয়াছে।

আশ্বিন মাস। শারদীয়া সপ্তমী।

দীনবন্ধুর গ্রামের বারোয়ারী পূজাতলায় লোকের ভীড় আর উৎসবের আনন্দ লাগিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে ট্রেণ হইতে গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়া দীনবন্ধু প্রথমেই বরাবর ঠাকুর-তলায় আসিল এবং দশভূজার পায়ের

তলায় মাথা স্পর্শ করিয়া নিবেদন জানাইল—মা গো, অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় স্বকৃত উপার্জ্জনের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যোগাড় ক'রে এনেচি ; নির্ব্বিবাদে ভোগ করতে দিও মা।

পশ্চাৎ হইতে কে একটা ঠেলা দিয়া কহিল, আরে এত দিন পরে দীনু ভায়া কোত্থেকে হঠাৎ? দীনবন্ধু তাহার হাত ধরিয়া ভীড়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

খাঁটী চিকিৎসা

শৈলবালা ও স্থধীরের মধ্যে বিবাহ হওয়াটা অসম্ভব হইলেও, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সম্ভব হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা অসম্ভবই বা কেন, আর কেমন করিয়াই বা তাহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত না হউক, সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে একটু দেওয়া যাউক।

শৈলবালা পয়সাওলা লোকের কন্যা। দেখিতে রূপসী না হইলেও কুরূপা নহে। স্থরূপা হউক, কুরূপা হউক, পিতামাতার সে ছিল খুব আদরের; কারণ, সাত ভাই বোনের মধ্যে সেই ছিল ছোট এবং সেই কারণেই তাহার অন্য বোনদের যে-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, শৈলবালা সে বয়স ছাড়াইয়া গেলেও, কর্ত্তা গোবিন্দবাবু এবং গিন্নী নৃত্যকালী তাহার বিবাহের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। এ-হেন সময়ে

একদা নৃত্যকালী কি একটা কার্য্যোপলক্ষে বসন্তপুরে তাহার ভ্রাতার বাটীতে আসিল। সঙ্গে আসিলেন—গোবিন্দবাবু এবং শৈল।

বহুদিন পরে বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমিতে আসিয়া নৃত্যকালী অন্তর গভীর আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিল। প্রত্যহ অপরাহ্ণের দিকে এ-পাড়া ও-পাড়ার বৌ-ঝি-গিন্নীরা নৃত্য-কালীকে ঘিরিয়া নিয়মিত আসর জমাইতে লাগিল। পার্শ্বে পাণের বাটা ও জর্দ্দার ডিবা লইয়া, পা ছড়াইয়া নৃত্যকালী ইহাদের লইয়া যে আলাপ-আলোচনা চালাইত, প্রতিদিনই তাহা প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত চলিত। এইরূপ সময়ে নানা গাল-গল্পের মধ্যে নৃত্যকালী এক দিন ঘোষালদের বড় গিন্নীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ লা বউ, তোদের চণ্ডীমণ্ডপে আজ সকালে কে-ছেলেটি বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল রে?"

"কোন্‌টি বল দেখি? হেমা কি? খুব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল?"

"না-না; ছোট ছোট চুল, কোঁক্‌ড়ান-কোঁক্‌ড়ান; গায়ের রং খুব ফর্সা। দিব্যি ছেলেটি। কার ছেলে বল্ দেখি?"

"ওঃ! বুঝতে পেরেছি। ও যে আমাদের নবীনের ছেলে রে—সুধীর!"

চোখ দুটা কপালের উপর টানিয়া নৃত্যকালী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“নবীন মিত্তিরের ছেলে ঐ অত বড় হয়েছে! ছেলেটি দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছে ত!”

রাণুর মা কহিল—“শুধু দেখতে সুন্দর নয়, ঠাকুরঝি, গাঁয়ের ভেতর ও-রকম গুণের ছেলে আর দুটি নেই। দুটো পাশ ক’রে, এবার তিনটে পাশের পড়া পড়চে। চুঁচড়োয় থেকে পড়ে। শনিবার শনিবার বাড়ী আসে।”

শৈলবালার বিবাহ ব্যাপারে এই দিন হইতেই সবার অলক্ষ্যে প্রজাপতির দৌত্য সুরু হইয়া গেল। এই দিনেই নৃত্যকালীর অন্তরে একটুখানি সাড়া দিয়া, যে অতি অস্পষ্ট বাসনার আভাস জাগিয়া উঠিল, দিনের পর দিন তাহাই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বছর দশ-বার আগেও নবীন মিত্রের অবস্থা ও-পাড়ার সকলের অপেক্ষা হীন ছিল। খুব কষ্টেই ইহাদের দিন কাটিত। তারপর নবীন মিত্র যোগাড়-যন্ত্র করিয়া বারোয়ারী-তলায় ছোট একখানি দোকান খোলে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই দোকানের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং এই সূত্রেই নবীনের দুঃখের সংসারে সুখ ও সচ্ছলতা দেখা দেয়। চিরকালের দরিদ্র নবীন মিত্র, অভাবের তীব্র পীড়ন সহ্য করিয়া, বর্ত্তমানে দোকানখানির কল্যাণে সে ধনী-শ্রেণীভুক্ত না হইতে

পারিলেও মধ্যবিত্ত পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে। তাহার দুই ছেলে। বড় সুবোধ, ছোট সুধীর। সুবোধের লেখা-পড়া হয় নাই। তাহাকে লইয়া বাপ দোকান চালায়। আর সুধীর এ বৎসর আই. এ. পাশ করিয়া থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে।

দিন চার-পাঁচ পরে নৃত্যকালী ভ্রাতা গুণময়কে ডাকিয়া কহিল, "হ্যাঁ রে গুণি, নবীন মিত্তিরের ছোট ছেলেটা কেমন রে?"

গুণময় কহিল, "হীরের টুকরো ছেলে দিদি! শৈলীর সঙ্গে যদি—"

সেদিনকার সেই অস্পষ্ট বাসনাটা এইবার স্পষ্টতম হইয়া নৃত্যকালীর অন্তরকে নাড়া দিতে লাগিল।

আরও দিনকয়েক পরে স্বয়ং গোবিন্দবাবু এক দিন নবীন মিত্রের কাছে প্রস্তাব পেশ করিলেন। তাহার কয়েক দিন পরেই এ-পক্ষ হইতে পাত্র দেখা হইল; ও-পক্ষ হইতেও পাত্রী দেখা হইল। প্রথমটা গোবিন্দবাবুর মনে একটুখানি খুঁত জাগিয়াছিল যে, তাঁহার মত ধনীর গৃহ নহে, মধ্যবিত্তের সংসার। কিন্তু একটা গোটা দিন ধরিয়া এ সম্বন্ধে মনে মনে বিচারের ফলে ঐ খুঁতটুকু অন্তর্হিত হইল।

সাধারণ লোক হইতে গোবিন্দবাবুর স্বভাব একটু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কোন বিষয়ে পরের পরামর্শ লইতেন না, বা টপ্

করিয়া কোন কাজও করিয়া ফেলিতেন না। নিজের মনে তিনি উত্তমরূপে 'বিচার' করিয়া তবে সব কাজ করিতেন। তিনি বলিতেন—"টপ্ করে কোন কাজ করতে নাই। নিজের অন্তরে যে মহাপুরুষটি আছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে হয়। নিজের মনের বিচারই আসল জিনিষ।" তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, মধ্যবিত্তের ঘরই বাঞ্ছনীয়; বেশী বিষ থাকিবে না; যখন যাহা বলা হইবে, কোন প্রতিবাদ আসিবে না।

সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়া, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে শৈলবালা ও সুধীরের বিবাহ একদিন অগ্রহায়ণের শুভদিনে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণে বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসিয়া গোবিন্দবাবু বোধ হয় মনে মনে কোন-কিছুর বিচার করিতেছিলেন। নৃত্যকালী মুখখানাকে ভার করিয়া আসিয়া কহিল—"বেয়াইকে

যেতে বল না, শৈল এখন দিনকতক আমার কাছে থাকুক।”

গোবিন্দবাবু কহিলেন—“তা কি হয়। বেয়াই নিজে যখন নিতে এসেছে, তখন পাঠাতেই হবে।

আজ পাঁচ বৎসর হইল শৈলবালার বিবাহ হইয়াছে। ইহার ভিতর ২০।২২ বার নৃত্যকালী শৈলকে এ বাটীতে আনিয়াছে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও ১০।১৫ দিনের বেশী তাহাকে নিজের কাছে রাখিতে পারে নাই। মধ্যবিত্ত ঘরের তাগাদায়, কয়েক দিন রাখিয়াই তাহাকে আবার পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এবার প্রথমে চিঠির মারফত তাগাদায়, পরে লোক-মারফত তাগাদায় নৃত্যকালী কর্ণপাত করে নাই। অতঃপর এক মাস গত হইলে স্বয়ং নবীন মিত্র পুত্রবধূকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, বারান্দার নালীর মুখে দোক্তা-খাওয়া পাণের পিক ফেলিয়া আসিয়া নৃত্যকালী বিরক্ত চিত্তে কহিল—“শৈলীর এখানে বিয়ে না দিলেই হ'ত।”

“দিলে কেন?”

“তুমিই ত দু'দিন ধরে 'বিচার' করে, তারপর মত করলে।”

গোবিন্দবাবু মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এখন ইহা লইয়া কথা কাটা-কাটি করিয়া ফল নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিলেন।

নৃত্যকালী কহিল—"আমি ত এ-ক্ষেপে কিছুতেই পাঠাবো না।"

গোবিন্দবাবু কোন কথা না বলিয়া স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর নৃত্যকালী বিরক্তমুখে এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেল।

বারান্দার পাশের ঘরে শৈলবালা বসিয়া মায়ের জন্য পাণ সাজিতেছিল। কথাগুলি তাহার কাণে গিয়াছিল। পাণ সাজিতে সাজিতে, মায়ের মত, তাহারও মুখখানা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবে উভয়ের বিরক্তিতে প্রভেদ আছে। যে কারণে মায়ের বিরক্তি, মেয়ের বিরক্তির কারণ ঠিক তাহার বিপরীত। সুতরাং মায়ের শেষ কথাটায়, এক দিকে তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল ও চক্ষু ভেদ করিয়া জল পড়-পড় হইল, অপর দিকে মায়ের প্রতি রাগে তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এবং রাগের ঝোঁকে, উপস্থিত অন্য কোন হাতিয়ার না পাইয়া, পাণগুলাতে খুব বেশী করিয়া চূণ দিয়া সাজিল।

রাত্রে ভিতরের বারান্দায় খাইতে বসিয়া, নবীন মিত্র গোবিন্দবাবুকে সবিনয়ে অতি ভদ্রভাবে এবং ভদ্র ভাষায় বলিল —"আপনার অনুরোধে আরও কিয়ৎ দিন না হয় বৌমাকে এখানে রাখতুম, কিন্তু আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, অনুধাবন ক'রে দেখুন—"

পাণ খাইয়া নৃত্যকালীর সাংঘাতিকভাবে গাল হাজিয়া গিয়াছিল। তাহারই জ্বালায় পাশের ঘরে সে নীরবে শুইয়াছিল। কিন্তু বেয়াইয়ের অনুধাবনের কথায়, যাহা এ যাবৎ কখনো করে নাই, তাহাই করিয়া বসিল। অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া নবীন মিত্রের সাক্ষাতে ফোঁস্ করিয়া বলিয়া উঠিল— তা বলে শৈলাকে এ মাসে আমি কিছুতেই পাঠাবো না।"

নবীন মিত্র কিন্তু না-ছোড়-বান্দা। পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে গোবিন্দবাবুকে বলিল—"বাড়ীতে ওঁরা যখন এত করেই ধরেছে, যে এ-মাসটা—

"আজ্ঞে আপনি আর প্রতিবন্ধক দেবেন না, বেহাই মশায়। আবার না হয় ও-মাসে আনলেই হবে। আপনি বেয়ানকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে এ-ক্ষেপটা বৌমাকে পাঠিয়ে দিন। ছেলেবেলা থেকেই বেয়ানকে ত জানি। সব বিষয়ে ওঁর জিদটা একটু বেশী হয়, তার পর একটু বোঝালে আর সেটা থাকে না।

মনে মনে গোবিন্দবাবু বলিলেন—"জেদ ত আপনারও কম নয়।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"তা হোলে শৈলকে নিয়ে যাবেনই ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

অগত্যা অড্ডাইটার গাড়ীতে শৈলবালাকে লইয়া যাইবার পক্ষে গোবিন্দবাবু আর অমত করিতে পারিলেন না। তবে মনে মনে ভাবিলেন—'এ স্থানে শৈলীর বিয়ে দেওয়াটা মস্ত ভুল হয়েছে। ভাবা গেছলো যে মধ্যবিত্ত ঘর ; কোন বিষয়ে কোন বাদ-প্রতিবাদ হবে না। কিন্তু এখন দেখছি, একেবারেই উল্টো। ভারি ভুল হয়েছে।'—অতঃপর মনে মনে এ বিষয়ে বিচার করিতে বসিলেন। বিচার করিয়া বুঝিলেন যে, না, ঠিকই হইয়াছে। অর্থাৎ ভুল হওয়াটাই ঠিক হইয়াছে। কারণ, জগৎ-সংসার যখন ভুল এবং নির্ভুল এই দুই লইয়া গঠিত, তখন সব-কিছুই নির্ভুল হইতে পারে না। ভুল হওয়ারও দরকার সুতরাং ভুল হওয়ার জন্য তাঁহার অন্তরে যে একটু খোঁচা লাগিতেছিল, সে খোঁচা বিচারের খোঁচায় উঠিয়া গেল। তিনি শৈলকে পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে মনোযোগ দিলেন।

কিন্তু খানিক পরে সংবাদ পাওয়া গেল, নৃত্যকালী অনশন আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদটা শুনিয়া গোবিন্দবাবু ব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। এদিকে যাহার জন্য অনশন, সেই শৈলবালার মুখখানা হাঁড়ির আকার ধারণ করিল।

গোবিন্দবাবু মহা ফাঁপরে পড়িলেন। এক দিকে বেয়াই তাহার বধূকে লইয়া যাবেন, অপর দিকে নৃত্যকালীর এই দুর্জ্জয় জেদ। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, যেখানে নৃত্যকালী শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে ছুটিলেন। স্ত্রীর অনশন-ভঙ্গের জন্য বহু সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। নৃত্যকালী দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিল, শৈলীকে এ-ক্ষেপ লইয়া যাওয়া হইলে, এই শয্যাই তাহার শেষ-শয্যা হইবে।

গোবিন্দবাবু বিচারে বসিলেন। বিচার করিয়া স্থির করিলেন, স্ত্রীর অনশন ভঙ্গ করানো সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহা লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ এবং নীতিগত কর্ত্তব্য। কিন্তু বেহাইকে নরম করিবার উপায় কি? অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার পর তিনি তাঁহার শয্যায় গিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দবাবুর অবশ্য অনশন নয়। তাঁহার হঠাৎ খুব অসুখ হইয়া পড়িল,—মাথা-ঘোরা, বুক-ব্যথা, দেহ ঝিম-ঝিম, চোখ-জ্বালা, কান ভোঁ-ভোঁ ইত্যাদি।

সঙ্গে-সঙ্গেই চাকর-বাকরের ছুটা-ছুটি পড়িয়া গেল; ডাক্তার আসিল, ঔষধ আসিল, ষ্টোভ জ্বলিল এবং চা, গরম দুধ, ওবলটীন হরলিক প্রভৃতির বান ডাকিতে সুরু করিল। বেগতিক দেখিয়া

নৃত্যকালী অনশন ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং নবীন মিত্রও শৈলবালাকে এ-যাত্রা রাখিয়া বসন্তপুরে ফিরিতে বাধ্য হইল।

৩

এ দিকে বসন্তপুরের বেয়ান ঠাকুরাণীর হইল বেজায় অভিমান; তিনি দরিদ্র বটেন, কিন্তু ছেলের মা ত! এক দিন তিনি শৈলবালার মামার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া আসিলেন,—"বড়লোক ব'লে, বেয়ান যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের কাছেই রাখবেন, এমন ত কোন কথা নেই। পনর দিনের কড়ার করে আজ এক মাস হ'য়ে গেল; তারপর কর্ত্তা নিজে গেলেন আনতে; অপমান করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাহ'লে মেয়ে নিয়েই থাকুন; আমরা আর আনবার নাম করব না।"

যথাসময়ে এ পক্ষের সকল কথা ভাসুরের চিঠি মারফত নৃত্যকালী জানিতে পারিল কিন্তু তাহার মন বিন্দুমাত্রও দমিল না। শাশুড়ী মামীকে ডাকিয়া যাহা বলিয়াছে, শৈলবালার কাণেও তাহা পৌঁছিল।

কিছুদিন গত হইলে হঠাৎ এক দিন নৃত্যকালীর দৃষ্টি শৈলবালার উপর বিশেষ পড়িয়া পড়িল। নৃত্যকালী দেখিল, কন্যা যেন তাহার দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। তাহার দেহে যেন আর পূর্ব্বের সে লাবণ্য নাই, চোখে যেন আর উজ্জ্বলতা নাই, পূর্ব্বের অপেক্ষা যেন ঢেঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে; মুখখানা যেন সর্ব্বদাই বিমর্ষ। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল—"তোর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে, শৈলা?"

শৈলবালা অপ্রসন্নচিত্তে কহিল, "না।"

"তবে এ রকম চেহারা তোর হচ্ছে কেন?"

"জানি না"—বলিয়া শৈল নীরবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, শৈলর শরীর ততই খারাপ হইতে লাগিল। নৃত্যকালী কন্যার জন্য মনে-মনে বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোবিন্দবাবুও বুঝিতে পারিলেন যে, শৈলর ভিতরে-ভিতরে কোন-একটা অসুখ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর কি জ্বর-টর হয়, কিছু বুঝতে পারিস্?"

শৈল কহিল—"না।"

"ক্ষিধে-টিধে বেশ হয় ত?"

"না।"

"শরীরে কোন গ্লানি-টানি—

"না।"

"ঘুম হয় ?"

"না।"

সুতরাং ডাক্তার আসিল।

ডাক্তার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দুইখানা প্রেস্‌ক্রুপসান্ লিখিয়া দিয়া বলিলেন—"দুর্ব্বলতা। ওষুধ দুটো চলুক। সকাল বেলা রোজ একটু করে ছানা আর বিকেলে ফাউলের সূপ খেতে দেবেন। স্নানাহার যেমন চলছে, তেমনি চলবে।"

কিন্তু তবুও শৈলর শরীর সারিল না। দিন-পনর পরে আর একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনিও বলিলেন—"দুর্ব্বলতা। ওষুধের চেয়ে 'চেঞ্জেই' বেশী উপকার হ'বে, আর শীগ্‌গীর হবে।" সুতরাং ডাক্তারটি কোন ওষুধের ব্যবস্থা না করিয়া তাহার ফী লইয়া চলিয়া গেল। নৃত্যকালী এই ডাক্তারের উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়া, রজনী সেন কবিরাজকে ডাক দিয়া আনাইল।

রজনী কবিরাজের দুই হপ্তায় সতর রকম ঔষধ, বাইশ রকম অনুপানের সহিত সেবন করিয়াও শৈলবালার বিশেষ কোন ফল হইল না। তখন অগত্যা গোবিন্দবাবু স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া 'চেঞ্জে'র উদ্দেশে মধুপুর রওনা হইলেন।

মধুপুরের লালগড় অঞ্চলে সুন্দর একখানি বাড়ী ভাড়া করা

হইয়াছিল। বাড়ীখানার নাম 'বল্লভ-কুঞ্জ'। কুঞ্জে গিয়া উঠিবার পনর দিনের মধ্যেই আর সকলের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইল; হইল না—শুধু শৈলবালার। শৈলর শরীর সেখানে আরও খারাপ হইল। সমস্ত দিন তাহার পেট ভার হইয়া থাকে, একমুঠা ভাত মুখে দিতে না দিতেই পেট ভরিয়া গিয়া একেবারে দম-সম্ হইয়া উঠে। সারা রাতই তাহার ঘুম হয় না। বাপ-মায়ের সঙ্গে সকালে-বিকালে বেড়াইতে বাহির হইতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। যদি তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে কোন দিন যায়, ত খানিক গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

সুতরাং এখানেও ডাক্তার আসিল, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন ডাক্তার বলিল,— "এখানকার জলের মাইকা, আর আয়রণ বোধ হয় ওঁর সিষ্টেমে স্যুট কর্‌ছে না। সুতরাং—

তখন 'সুতরাং'-এর সূত্র ধরিয়া যাহা করিবার, সেই বিষয়ে গোবিন্দবাবু মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ অন্য কোন স্থানে যাইতে হইবে।

কোথায় যাওয়া যায়? গিরিডি? সেখানেও ত মাইকা। দেওঘর, সিমুলতলা, ঝাঁঝাঁ?—ও-সব জায়গায় 'মাইকা' না থাকিলেও 'আয়রণ' ত আছেই।

নৃত্যকালী পরামর্শ দিল—"আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে হয়

না ? হাওয়াটা ত এখানকার ভাল ; জলটা না হয় ওর অপকার করছে। তা জলের বদলে 'সোডা' খেলে হয় না ?"

এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নৃত্যকালী এখানে বেশ সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। সম্মুখের বাড়ীটাতে শ্রীরামপুর হইতে কাহারা আসিয়া রহিয়াছে, রোজ দ্বিপ্রহরে সেখানে বেশ একটি মজলিস্ বসে। পিছনের বাড়ীটা, কোথাকার কোন্ জমীদারের। তাঁহাদের গিন্নী ও ছুটি বউ রোজ মজলিসের শোভা বৃদ্ধি করে। ওদিক্‌কার বাড়ী হইতেও তিন-চারি জন স্ত্রীলোক আসিয়া থাকে। এ বাড়ী হইতে নৃত্যকালী তাহার সাজা পানের ভরা-বাটা, জর্দ্দার কৌটা ও পিক্ ফেলিবার ছোট পিকদানীটি লইয়া প্রত্যহ তথায় হাজিরা দেয়। সুতরাং স্বদেশের এই কয়টি স্ত্রীলোকের দ্বারা বিদেশের এই দ্বিপ্রাহরিক আসর যে বেশ ভাল ভাবে জমিয়া উঠে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই নৃত্যকালীর মধুপুর ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ততটা নাই।

নৃত্যকালীর অদ্ভুত প্রশ্নে গোবিন্দবাবু বিষম চটিয়া গেলেও মুখে বেশী কিছু বলিলেন না ; তাহার অসম্ভব প্রশ্নটার উত্তর দিতে হইলে দু' এক কথায় কুলাইবেও না। শুধু বলিলেন— "চেঞ্জে আসা ত তোমার জন্যে নয়, শৈলীর জন্যে। সুতরাং তোমার ভাল লাগলেই ত আর হবে না ?"

নৃত্যকালী একদৃষ্টে গোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল। গোবিন্দবাবু কহিলেন—"কট্-মট্ করে চেয়ে থাকলে কি হবে! কোন হ্রাস্ব-দীর্ঘি জ্ঞান ত নেই। পড়েছিলে আমার হাতে, তাই দিব্যি পাণ-দোক্তা খেয়ে, পিক্ ফেলে, আর মজলিস্ জমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ, নইলে—

বেগতিক দেখিয়া নৃত্যকালী আর তথায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া বারান্দার ও-দিকটায় চলিয়া গেল।

ইহারই দিন তিন-চার পরে, মধুপুর ছাড়িয়া গোবিন্দবাবু সকলকে লইয়া কাশী আসিলেন।

৪

"তা হ'লে বাতাস লাগাটাই ত ঠিক?"

"তা'র আর কোন সন্দেহ নাই। কোন একটা ভৌতিক বাতাস লেগেছে।"

কাশীর 'রাণা-মহল' নামক পল্লীর একাংশে অবস্থিত

একখানি বাটীর নিচের তলার একখানি ঘরের মধ্যে একজন অবধূত সন্ন্যাসী ও গোবিন্দবাবুর মধ্যে উল্লিখিত কথা হইতেছিল।

একটুখানি নীরব থাকিয়া গোবিন্দবাবু অবধূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে উপায় ?"

অবধূত কহিলেন—"সেরে যাবে. তিন দিনের মধ্যেই রোগিণী আবার পূর্ব্বের মত হবে "

"দেখুন বাবা, মেয়েটিকে আমরা প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। সব রকম চিকিৎসা,—য়্যালোপ্যাথী, কবিরাজী—কিছুই করাতে বাকী রাখিনি, কিন্তু কোনই উপকার—"

"উপকার হবে কোত্থেকে। ভৌতিক বাতাস লেগেছে, ওর ব্যবস্থা ওরা কি করে ক'রবে! যাক্, কোন চিন্তা নাই আপনার। কাল সকালে মেয়েটির বাঁ পায়ের তিন টুকরা নখ আর মাথা থেকে তিন গাছা চুল নিয়ে আসবেন।"

পরদিন তিন টুকরা নখ ও তিনগাছা চুল লইয়া গোবিন্দবাবু যথাসময়ে অবধূতের কাছে আসিলেন। অবধূত তাহা রাখিয়া, গোবিন্দবাবুকে ১৬/১৫ লইয়া পরদিন আসিতে বলিলেন।

১৬/১৫ লইয়া গোবিন্দবাবু পরদিন যাইতেই অবধূত উহার পরিবর্ত্তে তাঁহার হাতে একটি মাটি দিয়া মুখ-আঁটা শামুক ও একটি পয়সা দিলেন। কহিলেন, "এর ভেতর মন্ত্রপূত সেই নখ আর চুল আছে। এটা বাড়ী গিয়েই রান্নার উনানের ঈশান

কোণে পুঁতে রাখতে হবে। কখনই আর এটা সেখান থেকে তুলবেন না। তার আগে আর একটা কাজ করতে হবে।”

গোবিন্দবাবু সবিনয়ে কহিলেন—“আজ্ঞা করুন।”

“এখান থেকে বেরিয়ে, ঐ পয়সাটা দিয়ে মুড়ী কিনবেন। পথে যেতে যেতে কোন কাল রংয়ের কুকুর পেলেই, মুড়ীগুলো তার সামনে ফেলে দেবেন। সে খেলেই, মেয়ে আপনার সেরে উঠবে। তবে, কাল রংয়ের কুকুর হওয়া চাই, মনে রাখবেন।”

শামুকটিকে ট্যাঁকের কাপড়ে তিন প্যাঁচ জড়াইয়া, অবধূতকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, গোবিন্দবাবু ‘রাণামহল’ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ‘হাতি-ফটকা’র গলির মুখেই মুড়ির দোকান ছিল; সেখান থেকে পয়সাটা দিয়া মুড়ী কিনিলেন। তার পর তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ইতঃস্তত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—কালো কুকুরের সন্ধানে।

খানিকটা আসিয়াই একটা কুকুর দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কুকুরটা পাটকিলে রংয়ের। সুতরাং চলিবে না।

সোনারপুরায় দুইটা কুকুর পরস্পর ঝগড়া বাঁধাইয়া, ছোট-খাটো একটা লড়াই চালাইতেছিল। গোবিন্দবাবু সোৎসাহে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাহার একটা রাঙ্গা,

অপরটা সাদায়-রাঙ্গায়। নিরাশ হইয়া গোবিন্দ বাবু অন্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

বড় রাস্তার ধারে আসিয়া গোবিন্দবাবু তাঁহার অভীষ্ট বস্তু পাইলেন। দেখিলেন, পথের ধারে একটি নিম গাছের ছাওয়ায় আরামে শুইয়া আছে একটি কাল রংয়ের—কুকুর নয়, কুকুরী।

হঠাৎ তিনি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইলেন এবং ভাবিলেন। ভাবিলেন, অবধূত বাবা বলেছেন—কুকুর; কুকুরী চলবে কি ? তিনি সন্দেহের সমস্যায় পড়িলেন।

মুড়ী খাওয়ানো সুতরাং হইল না। তিনি ফিরিলেন। অবধূত বাবার কাছে চলিলেন। আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাওয়াতে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাণা-মহলে যখন গেলেন, তখন তাঁর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। অবধূত বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাইয়েছেন ?"

"না; খাওয়ানো হয় নি। মেয়ে-কুকুর হলেও খাওয়াব কি ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, মেয়ে হোক, পুরুষ হোক—কুকুর হলেই হবে। তবে রংটা কালো হওয়া চাই।"

আবার গোবিন্দবাবু চলিলেন।

এই ঝঞ্ঝাট, দুর্ভোগ, পরিশ্রম, ক্লান্তি প্রভৃতির জন্য গোবিন্দ

বাবুর মন মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং নৃত্যকালীই যে ইহার মূল, সেজন্য তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিতে লাগিলেন। নৃত্য জেদ্ করিয়া শৈলকে না রাখিলে এত সব ব্যাপার কিছুই ঘটিত না—

কিন্তু কই? সেই কুকুরটি কই? সেই নিমতলাতেই আসিয়া গোবিন্দবাবু দেখিলেন, কুকুরটী স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি 'সোনারে'র দোকান ছিল। বৃদ্ধ 'সোনার' ডাল-ভাঙ্গা, সূতা-বাঁধা চশমাখানা নাকের উপর লাগাইয়া রূপার থাড়ু বানাইতেছিল। গোবিন্দবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ভেইয়া, একঠো কালা কুত্তা হিঁইপর থা'; ও কি-ধার্ চলা গেয়া বোল্‌নে সকো?"

স-চশমা চক্ষু উঠাইয়া সোনার কহিল—"নেহি, বাবুসাব। দেখিয়ে না, মহল্লাকা অন্দর, কোই-কাঁহা হো গা।"

সমস্ত মহল্লাটা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া শ্রীমতীকে পাওয়া গেল না। অগত্যা তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দবাবু বড় সড়ক ধরিয়া বরাবর অগ্রসর হইলেন।

মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর ফটকের রেলিংয়ে একটা কাল রংয়ের 'স্পেনিয়েল' লোহার শিকল দিয়া বাঁধা ছিল। গোবিন্দবাবু দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ ভাবে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেই, ভীষণ ব্যাপার সুরু হইল। সারমেয়প্রবর আক্রমণাত্মক

মনোভাব প্রকাশ করিয়া বিকট চাৎকার সুরু করিয়া দিল এবং দুই পায়ের উপর ভর দিয়া শিকল ছিঁড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। ফলে, সম্মুখের ঘর হইতে বাবু দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন, দারোয়ান ছুটিয়া আসিল, রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। বেগতিক বুঝিয়া গোবিন্দবাবু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

চৌমাথার কাছে আসিয়া একটা চায়ের দোকানের রোয়াকে গোবিন্দবাবু বসিয়া পড়িলেন। তিনি আর পারেন না। সাংঘাতিক ভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু দৈহিক ক্লান্তি নয়, মনের ক্লান্তিও তাঁহার চরমে পৌঁছিয়াছে। তিনি দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দোকানের বাবুটিকে কহিলেন—"চা দিন ত ভাল করে এক কাপ। এক কাপে হবে না, দু'কাপ দিন। উঃ!—দয়া করে একটু শীগগীর দেবেন।"

দোকানদার কহিল—"শীগগীর দিচ্ছি; দু'মিনিট। মুড়িটা ততক্ষণ খান।"

"ও মুড়ি খাবার জন্যে নয়, মশাই"—বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দবাবুর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

দু'একটী কথায় দোকানীর সহিত গোবিন্দবাবুর আলাপ বেশ গাঢ় হইয়া পড়িল। গোবিন্দবাবু সব কথাই দোকানীকে জানাইলেন। সমস্ত শুনিবার পর, দোকানী গোবিন্দবাবুর প্রতি

সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া বলিল—"আপনি বসুন, কালো কুকুর আমি আপনাকে আনিয়ে দেওয়াচ্ছি," বলিয়া দোকানী বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট্ পাঁচেকের মধ্যে একটা নিম্নশ্রেণীর লোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কহিল—"এ আপনাকে কালো কুকুর ধরে এনে দেবে। দিলে পরে গোটা-চারেক পয়সা একে বক্‌সিস করবেন।"

লোকটা কুকুর আনিতে চলিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় এগারটা। গোবিন্দবাবু চা-ওলার সঙ্গে গল্প করেন আর পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও লোকটা ফিরিল না। দোকানী বলিল,—"ও আনবেই ঠিক; কেন এত দেরী হচ্ছে বুঝতে পারছি না।"

ক্রমে বেলা একটা বাজিল। দোকানী বলিল—"আপনি বাইরের রোয়াকে, সার, বসুন। আমি বন্ধ করে এইবার বাসায় যাব। আপনি যাবেন না, কুকুর সে আনবেই।" দোকনী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

দেড়টা, দুইটা, আড়াইটা। লোকটার দেখা নাই। প্রায় তিনটার সময় গোবিন্দবাবু দেখিতে পাইলেন, লোকটা একটা কালো কুকুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিতেছে।

আবার গোবিন্দবাবুর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। অবশ্য পূর্ব্বের দীর্ঘ নিশ্বাস আর এ দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ—আকাশ-পাতাল।

কুকুরটিকে টানিতে টানিতে লোকটা একটু কাছে আসিতেই গোবিন্দবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কুকুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক এই সময় কুকুরটা মরিয়া হইয়া উঠিয়া এমন জোরে একটা টান দিল যে, সরু দড়ি সে টান সহ্য করিতে পারিল না, ছিঁড়িয়া গেল; আর নিমেষমধ্যে সে তীরবেগে ছুটিয়া একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

নৈরাশ্যের প্রবল বন্যায় গোবিন্দবাবুর ধৈর্য্যের বাঁধ এইবার ধ্বসিয়া গেল। 'ধুৎ—তেরি' বলিয়া তিনি হাতের মুড়ির ঠোঙ্গাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাসার অভিমুখে ফিরিলেন এবং মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

৫

কয়দিন হইল, গোবিন্দবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ সকাল হইতে তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। তিনি প্রত্যুষে একবার করিয়া পার্কে বেড়াইতে যান।

তারপর সারাদিনের ভিতর আর কোথায় বড় একটা বাহির হ'ন না। হ'ন ত, নৃত্যকালীকে বলিয়াই হ'ন। কিন্তু আজ সেই যে তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, বেলা দুই প্রহর অতীত হইতে চলিল এখনো ফেরেন নাই। নৃত্যকালী এবং তৎসহ বাটীর দাস-দাসী, এমন কি বিড়ালটা, পাখীটা পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। যে সব স্থানে তাঁহার যাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, সর্ব্বত্রই সন্ধান লওয়া হইল, কোন স্থান হইতেই তাঁহার সন্ধান মিলিল না। এ-দিকে বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। সন্ধ্যা হইল। তথাপি গোবিন্দবাবুর দেখা নাই।

নৃত্যকালী মহাচিন্তায় পড়িল। তাহার আহার-নিদ্রা লোপ হইল। শুধু গোটাকতক পাণ ছাড়া আর জলস্পর্শ করিল না। সারা রাত জাগিয়া কাণ পাতিয়া রহিল, কখন্ গোবিন্দ বাবুর বাড়ী ঢুকিবার পদশব্দ পাওয়া যায়। সারা রাত্রি ধরিয়া কত-কি শব্দ হইল—খুস্-খুস্, খুট্‌স্, ধুপ্-ধুপ্, ছর্-ঝর্, সপ্-সপ্, ঝণাৎ—কিন্তু গোবিন্দবাবুর পায়ের শব্দ নৃত্যকালীর কাণে আসিল না। পাশের বাড়ীর রান্নাঘরের তাক্ হইতে বিড়ালের মাছের কড়া ফেলিবার শব্দ হইল, ও-দিককার নতুন বাড়ীটার বুড়ো কর্ত্তা আর তাহার ছেলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিল; কোথাও কে ফুটপাতে চারপাই পাতিয়া মনের আবেগে 'রঘুপতি হামারা' গান জুড়িয়াছে—

তাহাও কাণে আসিয়া বাজিল ; বাজিল না শুধু গোবিন্দবাবুর পদশব্দ। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ তাহার কাণ ঝালা-পালা করিয়া তুলিল, তখন নৃত্যকালী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

সে-দিন বেলা দুপুর পর্য্যন্ত দেখিয়া থানায় খবর দেওয়া হইল ; কাগজে কাগজে গোবিন্দবাবুর ফটো সমেত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের কাছেই পত্র পাঠান হইল। সে-দিনও গোবিন্দবাবুর কোন সন্ধান মিলিল না।

তার পরদিনও চিন্তায়, উদ্বেগে, আশঙ্কায় কাটিয়া গেল। গোবিন্দবাবুর দেখা নাই।

চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে হঠাৎ তিনি আসিয়া হাজির। বাড়ীময় সোর-গোল পড়িয়া গেল। তিনি বরাবর তাঁহার দোতলার শয়ন-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। নৃত্যকালী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ গা, কি ব্যাপার বল ত ?"

গম্ভীর ভাবে গোবিন্দবাবু কহিলেন—"ব্যাপার কিছুই নয়,—বিচার।"

"কিসের বিচার ?"

"মেয়ে-জামাইয়ের ওপর কোন অবিচার হচ্ছে কি না, সেটা

দেখতে হবে ত ? হয় ত সেই জন্যেই শৈলীর শরীর দিন দিন ঐ রকম—"

"তা বিচারে কি দেখলে ?"

"দেখলুম, শৈলাকে এখানে আট্‌কে রেখে ভয়ানক অবিচার করা হ'চ্চে। নিজেকে দিয়েই পরীক্ষাটা তাই করে নিলুম।" বলিয়া গোবিন্দবাবু ঘরের দরজাটা ভাল করিয়া দিয়া আসিয়া, অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে কহিলেন—"ইচ্ছে করেই তিনটে দিন তোমাকে ছেড়ে ছিলুম। দেখলুম, তিনটে দিনেই তোমা-হারা হয়ে থেকে আমার কাছে পৃথিবী শূন্য বলে বোধ হ'ল, প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করতে লাগলো, মন একেবারে পাগল হয়ে উঠলো ; আর ও-বেচারাকে অর্থাৎ শৈলাকে আজ তিন মাস............

নৃত্যকালা অবাক হইয়া গোবিন্দবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সেই দিনই গোবিন্দবাবু নিজে শৈলবালাকে সঙ্গে করিয়া তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে দিয়া আসিবার জন্য আড়াইটার ট্রেণে যাত্রা করিলেন।

দিন-পনর পরে নবীন মিত্র বিশুদ্ধ ভাষায় পত্র লিখিয়া জানাইল—"এই কয় দিনেই বধূমাতার শরীর যৎপরানাস্তি সুস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার বাটীর সর্ব্বাঙ্গীয় কুশল কামনা করি। শ্রীচরণে নিবেদন স্যাৎ—ই

প্রাণনাথ ও তাহার ছেলে

আজ পরাণের কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে উঁকি দিয়া যাইতেছে।

উঁকি দেওয়ার দোষ নাই। বহুদিন ধরিয়া এক ক্লাসে পড়িয়াছি, একসঙ্গে বেড়াইয়াছি, একসঙ্গে খেলা করিয়াছি। সে আজ কত দিনের কথা! তারপর সে স্কুল ছাড়িয়া দিল। আর বড়-একটা তার সঙ্গে দেখা হইত না। আরও তারপরে— সে পশ্চিমের কোথায় চাকরী পাইয়া চলিয়া গেল। তার স্ত্রী-পুত্র এখানে বাড়ীতেই থাকিত। মধ্যে মধ্যে অল্প দু'চার দিনের জন্য সে যখন বাড়ী আসিত, সেই সময় তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইলে, আমাদের দু'জনের কি আনন্দই যে হইত! বহুদিন পরে আজ হঠাৎ পথের মধ্যে তাহার সহিত দেখা; সে বলিল যে, সে পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে।

আমরা এবং আর সকলে তাহাকে পরাণ বলিয়া ডাকিতাম

বটে, কিন্তু তাহার নাম—প্রাণনাথ। স্কুলের খাতায় তা'র নাম ছিল—শ্রীপ্রাণনাথ ঘোষ। হয়ত অনেক ভাবিয়া, অনেক বাছিয়া, তাহার এই নামটি রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গর্ভধারিণী তাহাকে ঐ নামে ত ডাকিতে পারিতেন না; তিনি তাহাকে পরাণ বলিয়া ডাকিতেন। শেষকালে এই নামটিই তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে চলন হইয়া গিয়াছিল।

স্কুলে সে যাইত, এবং নিত্যই যাইত। তাই বলিয়া পড়াশুনার সহিত তাহার বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। ইহার প্রমাণ,—আমি যখন কালিকা হাই স্কুলে তখনকার নবম—অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, তখন পরাণ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িত। তারপর, আমি পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার নাগাল ধরিয়া ফেলি। কিন্তু তাহার পর হইতে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি তাহার বয়সের উপর পড়াতে, সে প্রতি বৎসরই আমাদের সঙ্গে উপর ক্লাসে উঠিতে লাগিল; কোন বৎসরই তাহার উর্দ্ধগামী হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করা হয় নাই।

পরাণের সম্বন্ধে অনেক ঘটনার কথা জীবনের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। তাহার কোনটাই ভুলি নাই বা ভুলিবও না। আজ তাহার সহিত দেখা হইবার পর হইতে সেই সকল কথাই বার বার মনে পড়িতেছে। এক বারের একটা ঘটনার কথা বলি :—

কালিকা হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তখন আমরা পড়ি। সুতরাং প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জিওমেট্রির ঘণ্টা। অঙ্কের মাষ্টার আশু বাবু অত্যন্ত গোবেচারা গোছের লোক ছিলেন; তাঁহার ঘণ্টাতেই সারাদিনের মুলতুবি গল্প ও চেঁচামেচিটা পূরামাত্রায় চলিত। সে দিন তিনি আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে পরাণকে পাকড়াও করিলেন; কহিলেন, পড়া হয়েছে তোমার? পরাণ খুব বড় গোছের ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, হইয়াছে। আশু বাবু তাহার হাতে খড়ি দিয়া বলিলেন, এইটে Proof কর গে। পরাণ বোর্ডের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্লাস-ঘরটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। মাষ্টার মহাশয়ের চেয়ার ছিল পশ্চিম সীমায় আর বোর্ডখানি ছিল পূর্ব্বদিকের দেওয়াল-গাত্রে ঝুলান। দু'য়ের মধ্যে ব্যবধানও যেমন খুব বেশী, এই ঘণ্টায় গোলমালটাও হয় তেমনই খুব বেশী। বোর্ডের নিকটস্থ বেঞ্চেই সে দিন আমি বসিয়াছিলাম। পরাণকে কহিলাম, পারবি না ত, শুধু শুধু খড়ি হাতে এসে দাঁড়ালি কেন? পরাণ বলিল, চুপ কর না; কি ক'রে পারি দেখবি এখন। পারব না বললেই, সমস্ত ঘণ্টাটা দাঁড় করিয়ে রাখবে ত?

যাহা হউক, পরাণ কি যে করে, উৎসুক চিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পরাণ প্রথমেই খুব জাঁক করিয়া বড় বড়

দুইটা ত্রিভুজ আঁকিয়া ফেলিল। তারপর বীরের মত ভঙ্গিমায়, উচ্চকণ্ঠে আওড়াইয়া গেল—Let A B C and D E F be two triangles—। ইহার পর হইতেই পরাণের গলার স্বর ক্রমশঃ নীচু ও অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এত অস্পষ্ট যে, কাছে থাকিয়া আমরাও তাহার এক বিন্দু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরাণের proof করার আর বিরাম নাই। অস্পষ্টতার মধ্য হইতে 'therefore' আর 'so that' এই দু'টা কথা মধ্যে মধ্যে সে খুব জোর দিয়াই বলিতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে বলার পর, পরাণ বোর্ডের উপর খড়ির একটা শেষ ঠোকা জোরে মারিয়া, এই বলিয়া তাহার proof সমাপ্ত করিল—Therefore the angle B A C is greater than the angle E D F।—আশু বাবু পরাণের উদ্দেশে কহিলেন, Very good! কিন্তু আমাদের পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরাণ আশু বাবুর প্রশংসা লাভ করিয়াই তাঁহার কাছে জল খাইতে যাইবার ছুটী চাহিল। আশু বাবু কহিলেন, যাও। যাইবার সময় গোপনে পরাণ আমাদের কয় জনকেও যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গেল। আমরা তিন জন—আমি, চুণি ও রমেশ—পর পর ছুটী লইয়া বাহিরে গিয়া পরাণের সহিত মিলিত হইলাম। তখন পরাণ কহিল, জল খেতে ছুটী নিয়ে এলুম

খন, তখন চ' ভাই—হাজরার পুকুর থেকে সব জল খেয়ে আসি।

আমাদের স্কুল হইতে হাজরা পুকুর প্রায় একটি মাইল দূর। যেখানে বর্ত্তমানে হাজরা পার্ক হইয়াছে, ঐখানে একটি সুন্দর পুকুর ছিল। ঐ পুকুরটিকেই হাজরা পুকুর বলা হইত। আমরা চারিজনেই গেলাম এবং তৃষ্ণা না পাইলেও, আঁজলা আঁজলা করিয়া হাজরা পুকুরের জল পান করিলাম।

হাজরার বাগানে আমাদের দুইটি আকর্ষণের বস্তু ছিল। একটি—রবার গাছ, অপরটি 'টিউব্-টেলিগ্রাফ'। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ের উপর একটি রবারগাছ ছিল। খুব বড়। তাহার কাণ্ডে যতদূর পর্য্যন্ত নাগাল পাওয়া যায়—ছেলেরা ছুরি দিয়া নানা স্থানে চিরিয়া রাখিয়া আসিত এবং ঐ স্থান দিয়া যে আঠা বাহির হইত, পরদিন তাহা সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য আঠা বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু সেই তরল অবস্থায় উহা লওয়া যাইত না। ঘণ্টা-কতক পরে উহা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং কঠিন হইয়া যাইত। সুতরাং পরদিন ঐ আঠা চাঁচিয়া আনা হইত। 'টিউব টেলিগ্রাফ' দ্রব্যটি হইতেছে, একটি পাকা এবং ঢাকা নর্দ্দামা। নর্দ্দামাটি পুকুরের একটি কোণে, উহার উচ্চ পাড় হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নামিয়া উহার গর্ভে আসিয়া মিশিয়াছিল। উহার উপরে এবং নীচে

উভয় দিকে দুইটি মুখ ছিল। কেহ যদি উপরের মুখটিতে মুখ রাখিয়া কথা কহিত, তাহা হইলে নীচের মুখে কান পাতিয়া সেই কথা অতি স্পষ্টভাবে শোনা যাইত। পুকুরের জলে উদর পূর্ণ করিয়া, প্রথমে আমরা রবারগাছের গুঁড়ির বহু স্থানে অস্ত্রোপচার করিলাম। তাহার পর টেলিগ্রাফ লইয়া পড়িলাম। পালা করিয়া পরস্পরের মধ্যে তাহাতে এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিল—

পরাণ, ভাল আছিস্?

না, ভাই, বড্ড অসুখ।

কি অসুখ?

এই—ভারী ক্ষিদে পেয়েচে। তুই—কথা কচ্ছিস কে?

ভোম্বোলদাস ভট্‌চায্যি।

তোর বাড়ী কোথা?

সম্বলপুর।

তুই খাস কি?

ঝোল আর অম্বল।

তবে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুগে যা।

আবার চুণিতে আমাতে এইরূপ কথা হইল:—

চুণি, তুই না-কি গান গাইতে পারিস?

হ্যাঁ, শুন্‌বি না কি?

শুন্‌বো।

শোন্ তবে।—'রতন আসনে, রতন ভূষণে, যুগল রতন রাজে।'

বাঃ বাঃ—very nice!

কিন্তু দেখা গেল যে, আমাদের স্কুলের ছেলেরা সব বই হাতে ফিরিতেছে। অর্থাৎ চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। পরাণ কহিল, তার আর হয়েছে কি? বইগুলো আমাদের সব, ফেলা আর নন্দার কাছে ত জিম্মে ক'রে দিয়ে এসেছি। চ', 'কুস্তার মাঠে' ফুটবল খেলা দেখি গে।

কিন্তু ফুটবল খেলা দেখা ঘুরিয়া গেল, যখন আমাদের ক্লাসের শশধর পথের মধ্যে আমাদের সুসংবাদ শুনাইয়া দিল যে, শেষ ঘণ্টায় হেডমাষ্টার ক্লাসে আসিয়া আমাদের প্রত্যেককে এক টাকা করে 'ফাইন' করিয়াছেন।

সত্যিই তাই। পরদিন প্রথম ঘণ্টাতেই হেড মাষ্টার ক্লাসে আসিয়া তাঁহার উক্ত প্রকার 'রায়' প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তিন দিনের মধ্যে তোমরা 'ফাইন' না আনলে তোমাদের আর স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না।

কি আর করা যায়। চুণি, আমি আর রমেশ তিন জনে তিন দিনের মধ্যেই কোন রকমে যোগাড়-পত্র করিয়া যে যাহার 'ফাইন্' আনিয়া দিলাম; কিন্তু বেচারা পরাণ দিতে পারিল না।

শুনিলাম, সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। 'ফাইনে'র কথা ত আর বাবা কিম্বা মা'র কাছে বলা চলে না। আমি ঠাকুমা'র বাক্স হইতে একটা টাকা সরাইয়াছিলাম। তিনি চোখে একটু কম দেখিতেন। আমি তাঁকে ধরিয়া বসিলাম, ঠা'মা, একটা পয়সা দাও না, চাল-ছোলা কিনে খাব। তার পর ঠাকুমা বাক্স খুলিলে, আমি কৌশলে একটা টাকা ট্যাঁকস্থ করিয়া ফেলি। চুণি তাহার ম্যাজিক লণ্ঠনটি কাহাকে দেড় টাকায় বিক্রী করিয়া দিয়াছিল। রমেশ ৬৪টা রবিবার তার ঠাকুরদাদার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিবে, এই কনট্রাক্টে তাঁর কাছ থেকে একটা টাকা যোগাড় করিয়াছিল। কিন্তু পরাণ কোন দিকেই কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার ঠাকুমা যদিও ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন না, অধিকন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। চুণির মত তাহার কোন ম্যাজিক লণ্ঠনও ছিল না এবং রমেশের ঠাকুরদাদার মত তাঁহার ঠাকুরদাদার মাথায় পাকা চুল ছিল না। সুতরাং—তিন দিনের পর হেডমাষ্টার যখন তাহার 'ফাইনে'র জন্য শেষবার কড়া তাগাদা করিলেন, তখন সে কহিল, বাড়ীতে আমার মায়ের বড্ড অসুখ, স্যার, দু'চার দিন পর দেবো।

পরদিন ছিল শনিবার। তখনও স্কুল বসে নাই। পরাণ ও আমি জলের ঘরে জল খাইতে গিয়াছি। পাশেই মাষ্টার

মশাইদের বসিবার ঘর। মাঝের দেয়ালে খুব বড় একটা জানালা বসানো ছিল ; সেটা সর্ব্বদাই খোলা থাকিত। সুতরাং জলের ঘর হইতে মাষ্টার মশায়দের সব কথাই বেশ শুনা যাইত। শুনিলাম, হেড মাষ্টার বলিতেছেন, পরাণের 'ফাইন'টা কিছুতেই ছাড়া হবে না, আদায় করতেই হবে। তার পর তিনি স্কুলের বেহারা নীলুকে ডাকিয়া কহিলেন, আজ স্কুলের পর বাজার থেকে দু'পয়সার পাথুরে চূণ কিনে বাসায় দিয়ে আসবি, আমি আজ আর বাসায় যাব না। পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, স্কুলের ফেরতা কোথাও যাবেন না কি ? হেড মাষ্টার কহিলেন, হাঁ—একবার বেলঘোরে যেতে হবে। ভাল কথা, ওরে নীলু, চূণ দিতে যাবি, অমনি বলবি যে, বালিশের নীচে দুটো টাকা রেখে এসেছি গয়লার জন্যে ; তাকে যেন দিয়ে দেয়।

তার পরেই স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। আমরা দু'জনে জল খাইবার অছিলায় জলের ঘরে দাঁড়াইয়া যে চীনা-বাদাম খাইতেছিলাম, তাহা বন্ধ করিয়া ক্লাসে গেলাম।

পরের সোমবার স্কুলে আসিয়াই পরাণ তাহার 'ফাইন' দাখিল করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোত্থেকে জোগাড় করলি রে ? পরাণ কহিল, মাছের তেলেই মাছ ভাজলুম। এখন হইলে, সে ও কথাটার বদলে হয় ত বলিত, গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজো করলুম।

আমি কহিলাম, ব্যাপারটা কি খুলেই বল। পরাণ কহিল, টিফিনের সময় বলব এখন, কিন্তু খবরদার যেন কারও কাছে প্রকাশ করিস নে। তার পর টিফিনের সময় সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ—

সে শনিবার ছুটীর পরই দুই পয়সার পাথরচূণ কিনিয়া হেড মাষ্টারের বাসায় যায় ও চাকরটাকে ডাকিয়া বলে, বাবু এই চূণ পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভেতরে দাও গে; আর বল যে, বালিশের তলায় তিনি দুটো টাকা ফেলে গেছেন, দিতে বল্‌লেন। চাকরটা কিছু পরে আসিয়া টাকা দুইটা তাহাকে দিয়া গেল। তাহার পর, সেই তেল দিয়া এই মাছ ভাজা হইয়াছে।

পরাণের কাহিনী শুনিয়া আমি ত অবাক। সম্ভবতঃ, বেলঘরিয়া হইতে ফিরিয়া, হেড মাষ্টার মহাশয় ব্যাপারটি অবগত হইবার পর, মনের মধ্যে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুদ্ধিমানের মত 'কিল খাইয়া কিলটি চুরি' করাই সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন।

কত দিনের কথা! কিন্তু পরাণের এই কথাটাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে। আর এই কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ছেলের সম্বন্ধে এক দিনের একটা কথাও সমান ওজনে আসিয়া মনের মধ্যে পড়িতেছে। বাপের এই কথাসূত্রে ছেলের সেই কথাটিও বলিতে হয়। বলি ঃ—

ঘটনাটি এই সে-দিনের—পূজার ছুটীর মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বের।

সে, বোধ হয়, পরাণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার নাম—সুখেন্দু। দিব্য ছেলেটি। সুদর্শন, বুদ্ধিমান, মুখখানা হাসি-হাসি। কথায়-বার্ত্তায় ভাবে-ভঙ্গীতে চালে চলনে খুবই চট্‌পটে। কালিকা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সে পড়ে। স্কুলের মধ্যে তাহার নাম-ডাক খুবই। ভাগ্যচক্রে আমিও আজ কয় বৎসর হইতে স্কুলের হেড ক্লার্ক। পিতৃ-বন্ধু বলিয়া স্কুলের মধ্যে সে আমাকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। একটু ভয়ও যে না করিত, তাহা নয়। অন্য শিক্ষকগণ ও আমার অধীনস্থ তিন জন কেরাণীর তুলনায় এ বিষয়ে যে আমি ভাগ্যবান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কালিকা স্কুলের এখন আর সেদিন নাই। এখন তাহার মস্ত বাড়ী, বহু ছাত্র, বহু শিক্ষক। এখন তাহার আর সেই নয়টি মাত্র শ্রেণী লইয়া এগারোটি শিক্ষক নাই। সেক্‌সন ধরিয়া তাহাতে এখন প্রায় ২৬টি শ্রেণী ও ৩০ জন শিক্ষক। সে যুগের সে হেডমাষ্টারও নাই, আর সে সকল শিক্ষকও নাই।

তারক গুপ্ত নামে এক জন প্রবীণ শিক্ষক সেকেণ্ড ক্লাসে এক পিরিয়ড করিয়া পড়াতেন। তিনি একটু সে যুগের লোক।

অর্থাৎ, জামার উপর চাদর ব্যবহার করিতেন, বায়োস্কোপী চুলের বদলে সামনে পিছনে সমান চুল রাখিতেন এবং নির্দ্দোষ চক্ষু সত্ত্বেও চশমা লইতেন না। কিন্তু আরশোলাকে কোন্ যুগের লোক তাঁর মত ভয় করিত, তাহা আমি জানি না; সে যুগের সঙ্গে তারক গুপ্তের হয় ত কোন যোগাযোগ ছিল; যেহেতু ঐ প্রাণীটিকে তিনি যে ভয়ানকরূপে ভয় করিতেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত।

ক্লাসে ঢুকিয়াই তাঁহার প্রথম কাজ ছিল, নিজের গলায় চাদরখানি খুলিয়া চেয়ারের গলায় রাখা। আমার মনে হয়, যদি তাঁহাকে কোনদিন মালা-বদলরূপ এই চাদর বদলের কথা জিজ্ঞাসা করা হইত, তাহা হইলে এই উত্তরই হয় ত তিনি দিতেন যে, মাষ্টারী চেয়ারের সঙ্গেই যে তাঁহার সারা জীবনের মালা-বদলের সম্বন্ধ।

সে দিন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়াইয়া উঠিবার সময় চেয়ারের কাঁধ হইতে চাদরখানা লইতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তাহার যে খুঁটটা মেজের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে একটি টিনের কৌটা বাঁধা রহিয়াছে। তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া চাদরের খুঁট হইতে কৌটাটি খুলিতে লাগিলেন। সুখেন্দু বলিল, কৌটোয় কি এনেচেন, স্যার,—টিফিন্?

কৌটাটার ঢাকা খুলিতেই—হুলস্থূল ব্যাপার! অভাবনীয়

কাণ্ড! তারক গুপ্ত আঁৎকাইয়া উঠিয়া একটা ভয়ানক চীৎকার ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়িলেন। পাশের হাই-বেঞ্চখানা উল্টাইয়া ছেলেদের গায়ের উপর পড়িল। তারা কেউ বা ডিগবাজী খাইল, কেহ-বা আর এক জনের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল, কেহ-বা ছুটিয়া পলাইল। ক্লাসময় তখন শুধু হুডাহুড়ি, ছুটাছুটি, লাফালাফি, দাপাদাপি এবং চীৎকার চলিতে লাগিল। হেডমাষ্টার ছুটিয়া আসিলেন। আমিও গিয়া হাজির হইলাম।

ব্যাপার হইয়াছিল—আরশোলা; কৌটাটার ঢাকা খুলিতেই গোটা কুড়ি-পঁচিশ আরশোলা ফড়্‌ফড়্‌ করিয়া বাহির হইয়া তারক মাষ্টারের গায়ে, মুখে, মাথায়, জামায়, কাপড়ে একেবারে......! একটু সুস্থির হইলে, অফিসে বসিয়া তারক মাষ্টার কহিলেন, এ কাণ্ড নিশ্চয়ই ঐ সুখেন্দুটার। ও ছাড়া এ কাজ করবার সাহস আর কারও হবে না। সুখেন্দুকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে কহিল, তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল দিন, স্যার, তাই ছুঁয়ে আমি বল্‌চি,......। স্যারের মত আমারও যে আরশোলাকে ভয়ানক ভয়! উঁনি শিক্ষক, গুরুজন, ওঁর সঙ্গে কি না আমি........; এ কী বলচেন, স্যার!—তারক মাষ্টার কিন্তু অনবরতই মাথা নাড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং সর্ব্বশেষে কহিলেন, ও-ই ঠিক—ও-ই ঠিক, ও ছাড়া আর কেউ নয়।

ইহার দিন দুই পরে আর এক ব্যাপার।

সিনিয়ার অঙ্কের মাষ্টার রামজীবন বাবু এক মাসের ছুটী লইয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে রবীন বোস নামে এক নবীন বি-এস্-সি. আসিয়াছিলেন। প্রথম দিন মাষ্টারী করিবার পর দ্বিতীয় দিনে টিফিনের ঘণ্টায় তিনি কথঞ্চিৎ বিরক্ত এবং বিমর্ষ মুখে আমার ঘরে আসিয়া কহিলেন, সাংঘাতিক ব্যাপার মশাই! Splendid!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

উত্তরে তিনি যাহা কহিলেন, তাহা এইরূপ—

তিনি সবে মাত্র কাল আসিয়াছেন এবং সমস্ত মাষ্টার মহাশয়দের অপেক্ষা তিনিই বয়সে ছোট, এই জন্য তিনি টিফিনের সময় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বসিবার ঘরে না বসিয়া, সিগারেট খাইবার অভিপ্রায়ে শীতল বেহারার ঘরের একটি কোণে একটি টুলের উপর গিয়া বসেন এবং পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করেন। সিগারেটটি ধরাইয়া সবেমাত্র যেমন তাহাতে একটি টান দিয়াছেন, অমনই চকিতে একটি ছেলে প্রবেশ করিয়া যেন তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবার ছলে সহসা বলিয়া উঠিল—স্যার্! স্যার্!—রবীন বাবু চম্‌কাইয়া উঠিয়া মনে করিলেন যে, হেড্‌মাষ্টার বুঝি সেই দিকে আসিতেছে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের সিগারেটটি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই

ছেলেটি তাহা কুড়াইয়া লইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপারটি শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেটি কে?

তিনি কহিলেন, আমি ত নাম জানি না, তবে আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারব।

তার পর তিনি যাহাকে দেখাইয়া দিলেন, সে সেকেণ্ড ক্লাসের সুখেন্দু——পরাণের ছেলে।

আমি রবীন বাবুকে কহিলাম, এ নিয়ে আর হৈ-চৈ করবেন না যেন, ও হ'ল পরাণের ছেলে। তা হ'লে হয় ত আরও দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

—কে পরাণ?

পরাণ হ'ল—প্রাণনাথ ঘোষ, এই স্কুলের বছর চল্লিশ আগেকার রেজেষ্ট্রী খুঁজলে তার নাম পাওয়া যাবে।

উক্ত ঘটনার পর তিন মাস গত হইয়াছে। তাহার পর আজ হঠাৎ পথের মাঝে পরাণের সঙ্গে দেখা। তাই আজ সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার কথাটাই মনে পড়িতেছে, আর সেই সঙ্গে মনে পড়িতেছে—তার ঐ ছেলের কথা। আর মনে-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, কেবলই ইচ্ছা হইতেছে, কি করিলে আবার সেই দিনে—সেই বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারা যায়—যে

দিনে, যে বয়সে পরাণ আর আমরা হাজরা পুকুরে গিয়ে জল খাইতাম, 'টিউব-টেলিগ্রাফে' কথা কইতাম, ঠাকুমা'র বাক্স থেকে 'ফাইনের' টাকা চুরি করতাম ? সে দিন কি আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই ? যদি থাকে ত', কি তার মূল্য ? ষাট বছরের সুখে-দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে জড়ান এই হাড় ক'খানা কি তার মূল্য হিসাবে কুলাবে ? যদি কুলায় তা' হ'লে এ জীর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তি হ'ক ; আর সেই মূল্যে নূতন জীবন লাভ ক'রে যেন আবার সেই দিন—সেই বয়স ফিরে পাই।

ভক্তের ঠাকুর

সে ছিল গোবর্দ্ধন নম্বর টু। অর্থাৎ গ্রামে আর এক গোবর্দ্ধন ছিল, সে-ও গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী।

যে গাঁয়ে গোবর্দ্ধনের বাস, হঠাৎ সেই গাঁ এক দিন আন্দোলন-আলোচনায় সর-গরম হইয়া উঠিল। আন্দোলন-আলোচনার বিষয়টা—মন্দির-প্রবেশ। বিষয়টা যে দিন খুব গরম হইয়া চরমে উঠিল, সে দিন অস্পৃশ্যদের দল মরিয়া হইয়া চাটুয্যেদের গোপালজীর বৃহৎ মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া জড় হইল; উদ্দেশ্য—মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। স্পৃশ্যদলেরও সকলে ছুটিয়া আসিল,—এই ভয়ানক কার্য্যে বাধা দিবার জন্য। কিন্তু সব চেয়ে চিন্তা, ভয় ও বিপদে পড়িল—গোবর্দ্ধন। কারণ, সে-ই এই মন্দিরের পূজারী এবং তাহার হাতেই ইহার চাবিকাঠী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং বিগ্রহ এবং তাঁহার পূজা ও ভোগ-রাগাদির সকল ভার অর্পিত ছিল। চাটুয্যে মহাশয়রা থাকিতেন

কলিকাতায়। সেখানে তাঁহাদের বহুদিনের কন্‌ট্রাক্টারি ব্যবসা। তাহা হইতেই তাঁহাদের লক্ষ্মী। সুতরাং দেশের গোপালের সকল ভার গোবর্দ্ধনের উপর দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসা লইয়াই চিরকাল কলিকাতায় ব্যস্ত থাকিতেন। গোবর্দ্ধনের এ জন্য মাসিক ১০টা করিয়া টাকা এবং তিন বিঘা দেবোত্তর জমীর ধান যাহা বরাদ্দ ছিল, তাহাতেই সস্ত্রীক এবং সপুত্র-কন্যা গোবর্দ্ধনের এক রকমে চলিয়া যাইত।

সে দিনের ব্যাপারে কিন্তু গোবর্দ্ধনের মাথা ঘুরিয়া গেল। স্পৃশ্যের অপেক্ষা অস্পৃশ্যেরাই দলে ভারী ছিল এবং তাহাদের হস্তস্থিত বংশদণ্ডের মোট সংখ্যাও খুব ভারি ছিল। মন্দিরমধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে গিয়া যদি উভয় দলে লাঠা-লাঠি চলে এবং সেই লাঠি যদি গোপালের গায়ে আসিয়া লাগে! সুতরাং অবস্থা হিসাবে ব্যবস্থা করিতে গিয়া গোবর্দ্ধন মন্দিরে তালা বন্ধ করিয়া দিল এবং যত দিন না এ গোলযোগের মিটমাট হয়, তত দিন আর মন্দিরের তালা খুলিবেনা স্থির করিয়া মনে মনে মন্দিরের ঠাকুরকে নিবেদন জানাইল— "অপরাধ নিও না দেবতা ; তোমার মান যেন বজায় রাখতে পারি।"

কিন্তু মান বজায় রাখিতে গিয়া, দেবতাকে তিন দিন তিন রাত অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে অস্নাত অভুক্ত হইয়া কাটাইতে হইল। পাড়ার অনেকে আসিয়া এই অত্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ

কার্য্যের জন্য গোবর্দ্ধনের কাছে প্রতিবাদ জানাইল। উত্তরে গোবর্দ্ধন কহিল—"ঠাকুরের না খেলে বিশেষ কিছু হবে না, কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে, তাঁর মাহাত্ম্য নষ্ট হ'তে দিলে অনেক কিছুই হবে, দেবতার কোপে শিমুল-গাঁ তা হ'লে জ্ব'লে যাবে।"

তিন দিন পরে সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে চাটুয্যেদের মেজ কর্ত্তা শিমুল-গাঁয়ে ছুটিয়া আসিলেন। মন্দিরের চাবি খোলা হইল। তিন দিনের উপবাসী গোপাল-বিগ্রহের শুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনকে কহিলেন,—"এ তুমি কি করলে, গোবর্দ্ধন! তিন দিন ঠাকুর উপবাসী! এতে যে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!" গোবর্দ্ধন উত্তর করিল,—"এ না করলে যে সারা গাঁয়ে সর্ব্বনাশ ঘটতো চাটুয্যে মশাই!" কিন্তু মেজ কর্ত্তা সে কথা বুঝিলেন না। তিনি গোবর্দ্ধনের হাত হইতে সেই দিনই মন্দিরের সকল ভার কাড়িয়া লইয়া অন্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যাইবার সময় গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—"মন্দিরের ত্রি-সীমানায় আর যেন তুমি এসো না।"

গোবর্দ্ধন নীরবে আদেশ শ্রবণ করিল। তাহার একুশ বৎসরের গোপাল এবং গোপাল-সেবা এক দিনে তাহার অধিকারচ্যুত হইল। এ লইয়া মেজ কর্ত্তার উপর তাহার কোনই রাগ বা দুঃখ হইল না। শুধু গোপালের উদ্দেশে মনে

মনে সে বলিল,—"তুমি আমায় যখন ত্যাগ করলে, তখন আর তোমার সামনে আমি থাকবো না। আমার চল্লিশ বছরের শিমুল-গাঁ, আমার একুশ বছরের তুমি, চিরকালের জন্যে ত্যাগ ক'রে যাব। শিমুল-গাঁ আমার প্রাণ ছিল, তুমি আমার প্রাণেরও অধিক ছিলে। সেই শিমুল-গাঁ—সেই তুমি—" গোবর্দ্ধনের চোখ বাহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। চোখ মুছিয়া আপন মনে কহিল,—"জীবনে আর তোমার নাম মুখে আনবো না। তুমি বড় কঠিন, বড় নির্দ্দয়। তোমার কাছে বিচার নেই।"

গোপালের উপর দারুণ অভিমানে গোবর্দ্ধন এক সপ্তাহ পরে শিমুল-গাঁ পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী ও দুইটি পুত্র-কন্যা সহ যে দিন কলিকাতায় আসিবার জন্য যাত্রা করিল, সে দিন রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বহুদূরে দিগন্তের কোলে, গাছে-ঢাকা তাহার অস্পষ্ট শিমুল-গাঁয়ের দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিল। ঐ রেখার মত গাঁখানি। ঐখানে জগতের ঐশ্বর্য্য ঢালা রহিয়াছে। চল্লিশ বছরের পর এ তুমি কি করলে ঠাকুর! গোপাল! গোপাল! শিমুল-গাঁ!—আবার গোপালের নাম উচ্চারণ—গোপালকে ডাকা! না না, আর ও নাম মুখে আনা হবে না।

গোবর্দ্ধনের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

* * * *

কালীঘাটে ২৭নং হালদার লেনের একখানি খাপরার বাড়ী।

গোবর্দ্ধন কয় দিন হইল, এই বাড়ীরই একখানা ঘর ভাড়া লইয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ বাস করিতেছে।

শিমুলগাঁ হইতে আসিবার সময় সামান্য পাঁচ সাত টাকা যাহা নগদ পুঁজি ছিল, তাহাতেই কোন রকমে কয় দিন চলিতেছে। চারিটি প্রাণী। সে, মায়া, লক্ষ্মী ও খোকা। শীঘ্রই একটি কাজ জুটাইতে না পারিলে দুর্দ্দশার আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। কাল একটি সাহেবের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে, আজ তাহার কাছে যাইবে। সাহেবটি শিয়ালদ'র মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। পরিষ্কার বাঙ্গালায় তাহার সহিত আলাপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"টুমি বড়ো ভাল লোক আছে, ভগোবান টোমার ডুঃখ্য মোচন কারিবেন। কাল হামার সঙ্গে টুমি ডেখা করিও।"

সাহেবের ঠিকানা গোবর্দ্ধন এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া লইয়াছিল। কাল পথে দাঁড়াইয়া বেশী কথা তাঁহার সহিত হয় নাই। শুধু সামান্য দু'চারিটি কথা যাহা হইয়াছিল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সাহেব খুব ভাল এবং তাহাকে কোন কাজ-কর্ম্মের হয় ত সুবিধা করিয়া দিলেও দিতে পারেন। তাই আজ তাঁহার উদ্দেশে বাহির হইবার সময় গোবর্দ্ধনের অন্তরটা আশায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বাহির হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে মায়া যখন কহিল,—"নারায়ণ যেন আশা সফল করেন,

গোপালকে স্মরণ ক'রে বেরোও", তখন গোবর্দ্ধনের আর বাহির হওয়া হইল না। ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আবার ঐ নাম মুখে আন্‌লে? দেখছি, এখানে কোন ফল ফলবে না। প্রাণ-মন দিয়ে একুশ বছর যাঁর সেবা করলুম, শেষকালে তিনিই আমাকে দেশছাড়া করলেন। এই ত তাঁর বিচার!" গোবর্দ্ধন জুতা খুলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। নিকটে কাহাদের একটা পোষা কোকিল মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছিল। গোবর্দ্ধন সেই ডাকের সঙ্গে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তাহাদের শিমুল-গাঁয়ের গাছে গাছে যে অসংখ্য কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া গাঁ মাতাইয়া দেয়, তাহারই সহিত মনে মনে তুলনা করিতে লাগিল। সেই আর এই! প্রভাতে যখন গোপালের পূজার ফুল তুলিতে সে প্রায় সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া আসিত, তখন কত রকম পাখীর কত রকম ডাক! সে ডাকের ভিতর কি স্ফূর্ত্তি! প্রভাতের শিমুল-গাঁ যেন সেই সব পাখীরই একচেটিয়া জমিদারী। তাহাদের খিড়কীর জাম গাছটায় সেই হল্‌দে পাখীর দলগুলা কি বলিয়া শিষ দেয়?—"কেষ্ট গোকুলে।" কালো রংয়ের সেই লম্বা-লেজ পাখীগুলো—

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া গোবর্দ্ধন চোখ বুজিয়া বিছানায়

পড়িয়া রহিল। তাহার বিভোর মন এই সময়টা সারা শিমুল-গাঁখানা ঘুরিয়া আসিল। রথ-তলা, মানকীর বিল, রামচরণের দোকান, বারোয়ারীতলা, শিরোমণিপাড়ার হরিসভা, দত্তদের ফুলবাগান, দখিণডাঙ্গার নদীর ধারি, চাটুয্যেদের দোলমঞ্চ, গোপা—

গোবর্দ্ধন লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং জুতা পরিয়া সেই সাহেবটির উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

সেখানে সাহেবের সঙ্গে সামান্য কিছু সময়ের জন্য আলাপ হইবার পর সাহেব কহিল,—"হামি টোমাকে খুব ভালো ইংরাজী শিখাইয়া ডেবে। টোমার জীবনের ক্রমটা উন্নটি হইবে। আজ ঐ পাঁচটি টাকা লইয়া যাও, কাল টোমার সহিট কাজের কঠা হইবে। হামার কঠা অনুসারে চলিও, হামার বাক্য শুনিও, টোমার অণ্ডকার জীবনে সট্যকারের প্রেমের আলো পড়িবে।"

গোবর্দ্ধন কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, সাহেব তৎপূর্ব্বেই আবার কহিল,—"আসল ভগবান্‌কে আশ্‌রয়্‌ করিয়া ঠাকিবে। কাদা-মাটী, পাঠর কখনো ভগবান হইটে পারে না। টোমার সেই গোপালকে ছেড়ে এসেচ, সুণ্ডর করেচ। টোমার পাঠরের গোপাল যডি ভগবান হয়, টা হ'লে এই হামার ঘরের মেজেটে কটো ভগবান আছে বল ট?"

গোবর্দ্ধনের মাথায় কে যেন লাঠির আঘাত করিল।

চম্‌কাইয়া উঠিয়া সে কহিল, "কি বলছেন? আমার গোপাল ভগবান নয়?—শুধু এক টুকরো পাথর?"

"হ্যাঁ। এ কঠা টো টোমার ডেশেরই একজন মষ্ট বড় লোক প্রায়ই বলিয়া ঠাকেন। সেই লোকটির ওপর ভক্‌টিটে টোমরা টো গড গড! শুটুই এক টুকরা পাঠর! পাঠরের কি কোন শক্‌টি আছে? সে নির্জীব, চলট্‌-শক্‌টি-হীন জড়-পডার্ঠ মাট্‌ট্র।"

"আমার গোপাল পাথর?" রাগে গোবর্দ্ধনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চোখ দিয়া তাহার আগুনের ঝাজ বাহির হইতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতের টাকা পাঁচটা সাহেবের সম্মুখে টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, —"আমার গোপাল নুড়ি? আমার গোপাল পাথর?" নিমেষমাত্র আর না দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মিশনারী সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তার উপরে আসিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ, অনেক চেষ্টার পর, য়্যাটর্ণী 'দত্ত য়্যাণ্ড সমাজপতি'র অফিসে গোবর্দ্ধনের একটা কাজ হইয়াছে। বেতন—পঁচিশ টাকা। আলিপুর ও শিয়ালদহ কোর্টের মামলাগুলি তদ্বির করাই তাহার কাজ। সুতরাং

এদিক-ওদিক মাসে দু' পাঁচ টাকা আরও পাওনা আছে। কাজটি যিনি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তিনি এই উপরি পাওনার সুড়ুক-সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন বটে, তবে এ জন্য গোবর্দ্ধনের বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। গোবর্দ্ধন তাঁহাকে বলিয়াছিল—"উপরি পাওনা মানে ত চুরি ?" গোবর্দ্ধন সে সবে নারাজ। তবে, মোকর্দ্দমা জিত হইলে, মক্কেলদের নিকট হইতে বকসিস্ স্বরূপ কিছু পাওনা আছে। গোবর্দ্ধন তাহাতে রাজী। ইহা ছাড়া, পূজার সময় এ আফিসে সকলকে এক মাসের মাহিনা স্বতন্ত্র বোনাস স্বরূপ দেওয়া হয়।

সুতরাং চাকুরিটা পাইয়া, মায়ার তাগিদে গোবর্দ্ধন এক দিন গিয়া কালীমায়ের পূজা দিয়া আসিল। পূজান্তে প্রসাদ লইয়া সে মা-কালার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া যখন সে চোখ চাহিল, তখন তাহার মনে হইল, যেন চাটুয্যে বাবুদের মন্দির মধ্যে সে গোপালকে প্রণাম করিয়া, তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে এবং ত্রিভঙ্গিমঠামে, বাঁশী হাতে, ব্রজের প্রাণ গোপাল, যেন প্রসন্ন নয়নে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মন্দিরমধ্যে গোপালকে ঘিরিয়া চারিদিকেই গাঢ় অন্ধকার। ক্রমে ক্রমে সেই অন্ধকার মধ্যেই যেন গোপাল মিলাইয়া গেল এবং তাহার স্থানে অল্প অল্প করিয়া আবার কালী-মায়ের মাথার

স্বর্ণ-মুকুট, তাঁহার চতুর্ভুজ, তাঁহার রুধিরাপ্লুত খড়গ, তাঁহার হস্তধৃত অসুরের মুণ্ড, লোলজিহ্বা প্রভৃতি আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল; আবার মন্দিরমধ্যে লোক-কোলাহল শ্রুত হইল।

পরের সপ্তাহে আলিপুর জজ-কোর্টে 'দত্ত-সমাজপতি'দের একটি মামলার দিন ছিল। আগের দিন মিঃ সমাজপতি গোবর্দ্ধনকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আহারাদি করিয়া বেলা ১১টার মধ্যেই সে যেন বাসা হইতে বরাবর কোর্টে হাজির হয় এবং দিন লইবার দরখাস্তখানি উকীলকে দিয়া পেশ করিয়া দেয়,—নহিলে হয় ত মামলা এক-তরফাই ডিক্রী হইয়া যাইবে।

সুতরাং পরদিন সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া গোবর্দ্ধন আলিপুর জজের কোর্টে গিয়া হাজির হইল এবং তখনও ১১টা বাজিতে মিনিট পনর-কুড়ি দেরী থাকায়, সে বৃক্ষতলে এক পাণ-ওয়ালার আড্ডায় বসিয়া পাণ ও তামাকের সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের উকীলের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি কহিলেন, "কোর্ট বসলেই সকলের আগে দরখাস্তখানা পেষকারের কাছে ফাইল করে দেবেন। আমি সেকেণ্ড মুনসেফের ঘরে একটা মামলায় ব্যস্ত থাকবো।"

কিছু পরে পাণ-ওয়ালার আড্ডায় আর এক জন আসিয়া গোবর্দ্ধনের সম্মুখস্থ কেরাসিনের বাক্সটি অধিকার করিয়া

কহিল—"নমস্কার, চক্কোত্তি মশাই।" এ লোকটির সঙ্গে পূর্ব্বে এক দিন এইখানেই গোবর্দ্ধনের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। আজও উভয়ের মধ্যে নানারূপ আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হইল। আলাপের বিষয়—প্রথমটা বেহারের ভূমিকম্প হইতে সুরু হইয়া ক্রমে নেপাল, হিমালয়, দেশের লোকের নৈতিক অবনতি, পাপ, দুঃখ-দুর্দ্দশা, মহাত্মা গান্ধী, অস্পৃশ্যতা, মন্দির-প্রবেশ প্রভৃতির পর, কথাটা আসিয়া পড়িল—পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে। পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখ, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্বতা, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, মুক্ত বায়ু, ফাঁকা মাঠ, পাখীর ডাক—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আপনার বাড়ী কোন্ গাঁ?"

"যশোর—মশ্মিমনগর। কপোতাক্ষীর ধারেই। কি চমৎকার যায়গা মশাই!"

"আমার বাড়ী—শিমুল গাঁ,—এই তারকেশ্বর থেকে মোটে মাইল তিনেক পথ। এ রকম গাঁ আপনি দেখেননি ক'। ৪০ বছর মধ্যে গাঁ-ছাড়া হয়ে কোথাও থাকি নি। কি মহাপাপে যে......"

"আচ্ছা, আপনাদের শিমুল-গাঁয়ে বাঁওড় আছে?—নদী?"

"আমাদের শিমুল-গাঁয়ের মত গাঁ আর কোথাও নেই—

কোথাও নেই। সেখানে থাকলে কি এমন সময় এই রকম ভাত গিলে... . এমন সময় ত সেখানে স্নানই আমার হয় নি। এখন হয় ত দখিণডাঙ্গার নদীর ঘাটে স্নান করছি। স্নান করেই গোপালের ভোগ......"

শিমুল গাঁ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা—অর্থাৎ মাঠের শেষে তাহার ছোট্ট ষ্টেশনটি, তাহার নদী, বন, হাট-তলা, পথ-ঘাট, জোলের ধারে বাউরি-সাঁওতালদের সারি সারি কুটীর, নদীর ওপারে দিগন্ত-প্রসারিত বিলখালীর জলা, বোষ্টমপাড়ার বাগান, শিরোমণিপাড়ার হরিসভা, রামচরণের দোকান প্রভৃতির কথা ক্রমে ক্রমে এত জমিয়া উঠিল যে, কখন্ যে আদালত বসিয়া গেল, কখন্ যে প্রথম সব-জজের কোর্টের সম্মুখের দালান হইতে পেয়াদা হাঁকিয়া গেল—"সত্যভামা দাসী হাজিই-ই-ইর। সত্যভামা দাসী হাজি-ই-ই-ইর!" তাহা গোবর্দ্ধনের কাণেও পৌঁছাইল না এবং সত্যভামা দাসীর পক্ষ হইতে কেহ হাজির না হওয়াতে, মামলা যে এক-তরফা ডিক্রী হইয়া গেল, সে-খবরও সে কিছুই পাইল না। সে সময় সে পাশের লোকটিকে চাটুয্যেদের বহুকালের মন্দিরের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে শুনাইয়া, তাহার পরে কহিল—"আপনার বুক-পকেটে ও জিনিষটি কি দাদা?"

"ও একটা সেণ্ট্—কি নামটা?—বেশ গন্ধ! ঐ আমার ছোট বৌমাটি......"

"জানি—জানি। পূজোর সময় মেজবাবু ঠিক ঐ রকম একশিশি গন্ধ আমায় দিয়েছিলেন। সুন্দর বাস, মশাই। মেজবাবু বলেছিলেন—'মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা মেখো হে।' তা' অমন জিনিষ, আমার মেখে নষ্ট করতে মায়া হ'ল, মশাই। আমি তাই মাঝে মাঝে গোপালকে স্নানের পর মাখিয়ে দিতুম। এখনও মন্দিরের কুলুঙ্গীতে প্রায় আধ-শিশিটাক আছে।"

প্রথম সবজজের ঘরের প্রাঙ্গণ হইতে আবার যখন হাঁক পড়িল—'গুইরাম মণ্ডল—হা-আ—জ্জির', তখন গোবর্দ্ধনের হুঁস হইল এবং তাড়াতাড়ি হাতের খেলো হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, ছুটিয়া আদলত-ঘরে গিয়া শুনিল যে, সত্যভামা দাসীর মোকর্দ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গিয়াছে।

* * *

মায়া মলিন-মুখে কহিল—"তাই ত! এমন সুবিধের কাজটা জবাব হয়ে গেল! আগে কাজ সেরে, তার পর ব'সে ব'সে গল্প করতে হয়।"

গোবর্দ্ধন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল "আরে, গল্প করা আর একতরফা ডিক্রী হয়ে যাওয়া,—ও সব ত হ'ল গিয়ে—উপলক্ষ। তুমি আসল কথাটা এর ভেতরকার কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না যে!"

"আসল কথাটা কি ?"

"আসল কথা—গোপাল—গোপাল ! দেখছ না, এতই তাঁর আমার ওপর রাগ যে, সেবা নিলেন না, গাঁ থেকে তাড়ালেন ; তার পর একটা কাজ-কর্ম্ম ক'রে যে দু'বেলা দু'টি খাই, তা'তে পর্য্যন্ত বাদ সাধছেন। মন্দিরমধ্যে ব'সে সেই ক্ষুদে ঠাকুরটিরই যে এই সব ফিকির-ফন্দি, এ তুমি এখনও বুঝতে পারছ না ?"

"তা' হলে, কি করবে এখন ? চুপ ক'রে সহরে এসে ব'সে থাকলে ত চলবে না।"

"কিন্তু চাকরী আর করব না। যার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চ'লে আসতে হ'ল, তার পরে আর কারও চাকরী করতে পারব না। তোমার ঐ রুলি দু'গাছা বিক্রী ক'রে ছোটখাট একখানা মুদিখানা হোক আর যা' হোক দোকান করবো। দেখি কি হয়।"

সুতরাং দাসত্বের বদলে গোবর্দ্ধন দোকান খুলিল। কালীঘাট গঙ্গার ধারের রাস্তার উপর, সামান্য একখানা মুদীখানা।—গোপালের উপর রাগ করিয়া, কালীমায়ের নামে দোকানের নাম লিখাইয়া সাইনবোর্ড ঝুলাইল—'কালী-ভাণ্ডার'। পাঁচ আনা দিয়া একখানা টিনের প্লেট কিনিয়া দোকানের ভিতরকার দেওয়ালে টাঙাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'আজ নগদ, কাল ধার।' দোকানে কিছু কিছু প্রায় সব রকমই

ছিল। তেল, নুণ, আটা, ময়দা, চিনি, মিছরি, কিছু কিছু মশলা, কিছু মুড়ি, কিছু মুড়কী, কিছু বাতাসা। পাকা চাঁপাকলার একটা ছোট কাঁদি কিনিয়া আড়ার সহিত বাঁধিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। র‍্যাকের উপর গোটা-কয়েক কাচ-দেওয়া টীনের বাক্সে—চা, বিস্কুট, কিসমিস, লজেঞ্জুস, গুলিসূতা, কালীর বড়া, প্যাকেট-চানাচুর, পবিত্র গোটা, স্বদেশী মনোরমা চাটনী প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। এ সব ছাড়া দুই চারিখানা কালীঘাটের পট, দুই-দশ দিস্তা বালির কাগজ, জাপানী লেড পেন্সিল, চিলের কলম। এই লইয়াই ‘কালী-ভাণ্ডার’।

তবু রোজ পাঁচরকমে দুই টাকা, নয় সিকা বিক্রয় হয়। তাহাতে আট দশ আনা লাভ থাকে। নূতন দোকান—পরে হয় ত আরও হইবে। সকালে স্নান করিয়া আসিয়া গোবর্দ্ধন দোকান খুলে। বেলা ১২টার সময় দোকান বন্ধ করিয়া বাসায় যায়। তা’র পর আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বেলা চারিটার সময় দোকানে আসে ও ৯টা ৯৷৷টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখে।

বেলা ১১টার পর আর খরিদদার থাকে না বলিলেই হয়। সে সময় অধিকাংশ দিন সে একদৃষ্টে সম্মুখের কালীবাড়ী যাইবার পথের উপর যাত্রি-চলাচল দেখিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকের বাড়ী হয় ত কলিকাতায় নহে। কত দেশ হইতে

কত যাত্রী এই পথ দিয়া প্রত্যহ আসে ও যায়। দোকানের মাচায় ছোট চৌকিখানিতে বসিয়া বসিয়া গোবর্দ্ধন নিত্য ইহাদের দেখে আর কত কথাই ভাবে। সে ভাবে,—শিমুল-গাঁয়ের কেহ কোন দিন আসে না। যদি কেহ আসে আর তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যায় ত বেশ হয়। তা হ'লে সেখানকার সংবাদটা একবার পায়। রামচরণ, নিতাই কাকা, সিদ্ধু ঘোষাল—ওরা সব কেমন আছে, কে জানে। 'সামতা'-বিলটা এত শীতের দিনে একেবারেই শুকিয়ে গেছে আর কি। বিষ্টু বাগ্দীরই পোয়া বারো—বেটা খুব কই-মাগুর ধরছে। শম্মা থাকলে তাকে আর মাছের কাছে যেতে হ'ত না। আউস ভুঁইখানাতে চারটি কলাই বুনেও আসতে পারলুম না। আর বুনে দিলেই বা কি হ'ত? ফকুরে হাড়ির ছাগলপালের জ্বালায় ত আর কিছু পাওয়া যেত না। সেবার পাঁচ আড়ি কড়াই গোপালের ভোগের জন্যে———বাতাসা? আছে বই কি। সাড়ে চার গণ্ডা ক'রে। আচ্ছা, নিয়ে যাও খুকী, পাঁচ গণ্ডা দেবো। সুজি চাই বাবু? না, মোটা দানা নেই।—কি গা, মা?"

"বাবা, তুমি চান ক'রে কাপড় ছেড়ে দোকানে এসেছ ত?"

"হ্যাঁ গো মা। কেন বল দেখি?" গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একজন বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"একটিবার এস না বাবা আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে।

আমার এই খোকা ব'সে দোকান চৌকী দেবে এখন। বড় বিপদে পড়েছি, বাবা।"

বিপদের নাম শুনিয়া গোবর্দ্ধন লাফাইয়া দোকানের বাহিরে আসিল ও বৃদ্ধার পিছন পিছন চলিল। খানিকটা আসিয়া বৃদ্ধা কহিল,—"আজ যে আসতে পারবেন না, তা এতটা বেলা হ'ল, একটা খবরও ত লোক পাঠায়। ভাগ্যিস তুমি বাবা ছিলে, নইলে গোপালের ভোগটির জন্যে যে কার কা'ছে এত বেলায় ছুট্‌তে হ'ত——"

"কি বলছ গা, মা? তোমার বাড়ি বুঝি নারায়ণ আছেন?"

"হিঁ বাবা।"

"সেই গোপালের ভোগের জন্যে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্ছ?"

"হিঁ বাবা। সব ঠিক করা আছে। বেশী দেরী তোমার হবে না। নইলে এই এত বেলায়—ও বাবা, ফিরে চল্লে কেন, কি হ'ল গো বাবা? অ দোকানী বাবা! অ ছেলে! ভোগটুকু গোপালের আমার দিয়ে যা বাবা!"

কে কারই বা কথা শুনে। গোবর্দ্ধন হন্ হন্ করিয়া তাহার দোকানের অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। একবার দূর হইতে হাত নাড়িয়া বলিল,—"হবে না বাছা,. হবে না; আমার দ্বারা হবে না।"

বৃদ্ধা থ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

   

পরের সোমবার দুপুরবেলা হঠাৎ গোবৰ্দ্ধনের চরিত্র খারাপ হইয়া গেল। যেহেতু, ওদিককার ঘরের কালাচরণ চক্ষু রক্তবরণ ও ঘুসি শক্ত করিয়া ধারণ করত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ও যাহা কহিল, তাহার অর্থ এই যে, কেন গোবৰ্দ্ধন একটু আগে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ছিল ?

কালীচরণের স্ত্রীর বয়স ছিল একুশ এবং অনেকবারের অনেক চেষ্টার পর কয়েক মাস হইল এইবার তাহাকে সর্ব্বপ্রথম স্বামীর ঘর করিতে রাজী করাইতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহার ভাল করিয়া মন বসে নাই।

গোবৰ্দ্ধন থত-মত খাইয়া কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া কালাচরণ রুখিয়া কহিল,—"তুমি কত বড়—ওর নাম গিয়ে—আমি বুঝে নেবো। মেয়েমানুষের দিকে চেয়ে থাকা তোমার আমি ঘুচিয়ে দেবো।"

গোবৰ্দ্ধন কহিল,—"কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেক সময় আমি অন্যমনে একদৃষ্টে হয় ত চেয়ে থাকি, কিন্তু কারও দিকে লক্ষ্য ক'রে চেয়ে থাকি না। বাইরের দৃষ্টি আমার যে দিকে থাকে, ভেতরের দৃষ্টি আমার সে দিকে থাকে না, কালাচরণ বাবু।"

"ভেতরের দৃষ্টিটা কোন্ দিকে থাকে ?"

"ভেতরের দৃষ্টি দিয়ে সদাই আমার চোখের ওপর ভাসে—আমার প্রাণ, আমার শিমুল-গাঁ, আমার প্রাণের অধিক—গোপাল! গোপাল!"

হাতের ঘুসিটা আরও শক্ত করিয়া কালীচরণ কহিল,—"প্রাণের অধিক গোপাল! গোপালকে দেখাচ্ছি। ভণ্ডামি ভাল ক'রে ভেঙ্গে দিচ্ছি,—পাজি, শূয়োর, র‍্যাস্‌কাল্‌!"

পরদিন সকালে গোবর্দ্ধন মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া দোকানের চাবি লইয়া বাহির হইল। কিন্তু দোকানের সম্মুখে আসিয়াই একেবারে চমকাইয়া উঠিল। দেখিল—দোকানের ঝাঁপ খোলা হইয়াছে এবং কালী বসিয়া বেচা-কেনা করিতেছে।

গোবর্দ্ধন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালী এক খদ্দেরকে মুড়ি-মুড়কী দিতে দিতে গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমার কি চাই?

ব্যাপার সোজা বা সামান্য নহে। সুতরাং অনেক লোক জমিয়া গেল। গোবর্দ্ধনকে ওখানকার বড় কেহ চিনে না। বরঞ্চ কালীকে অনেকেই জানে। কালী দোকানের চৌকীর উপর বসিয়াই কহিল—"আরে মশাই, কেউ থানায় একবার খবরটা দিন না দয়া ক'রে। আমার জল-জ্যান্ত এই 'কালী-ভাণ্ডারে' উনি কোথাকার কে গোবর্দ্ধন উড়ে এসে জুড়ে বসতে চান।"

পথের একজন লোক গোবর্দ্ধনকে এক ধাক্কা দিল। আর এক জন আর এক ধাক্কা দিল। আর এক জন তাহাকে টানিয়া গঙ্গার পথের দিকে লইয়া চলিল। এক জন কহিল,—"লোকটা খুব ধড়িবাজ ত! এ রকম জোচ্চুরী এই প্রথম দেখলুম।" একজন কহিল,—"পাগোল—পাগোল।" কালী কহিল,—"বেশ ক'রে গঙ্গার জলে চুবিয়ে ধর গে, একটু মাথার গরম কাটুক।"

অতঃপর শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর "কালীভাণ্ডার" সেই দিন হইতে শ্রীযুক্ত কালীচরণ পালের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইল এবং সেই দিন হইতে বেকার কালীচরণ সাজান-গোছানো সাকার দোকানের মালিক হইয়া সকাল-বিকালে দোকানে বসিয়া খরিদ্দার বিদায় করিতে করিতে কহিতে লাগিল;—"আটা পাঁচপো সাড়ে আট পয়সা। কত তেল গো তোমার? গুড় —আখের না খেজুরের?"

ও দিকে গোবর্দ্ধন কালীঘাটের পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ছন্ন-ছাড়ার মত সকাল দুপুর সন্ধ্যা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার ঘরে অন্ন নাই, পরণে বসন নাই, সঞ্চিত অর্থ নাই; অথচ সেজন্য তাহার কোন চিন্তাও নাই। তাহার এক চিন্তা—শিমুল-গাঁ—তাহার প্রাণের শিমুল-গাঁ—আর তারও উপরের চিন্তা—না, সে নাম সে আর মুখে আনিবে না। সে নিষ্ঠুরের নাম যেখানে হইবে, সেখানকার মাটী পর্য্যন্ত সে মাড়াইবে না।

উঃ কি কঠিন—কি অবিচারক! মিশনারী সাহেবটার কথাই বোধ হয় সত্যি। হয় ত সত্যিই শুধু নুড়ি—শুধু পাথরের ডেলা।

*　　　*　　　*

"তোমার বাড়ী কোথা?"

"শিমুল-গাঁ। তারকেশ্বরের কাছে।"

"ও দিকে খুব ম্যালেরিয়া। না?"

"তা একটু আধটু আছে বৈ কি, মশাই।"

"পথ-ঘাট কি রকম?"

"মেঠো পথ।"

"তা এরিরই এত সুখ্যাতি করছিলে?"

"সুখ্যাতি? তার আর তুলনা হয় না। আপনাদের কোটি কোলকাতা একসঙ্গে ধরলে, আমাদের শিমুল-গাঁয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না।"

"নদী আছে?"

"নদী ত অনেক দেশেই আছে। আমাদের শিমুল-গাঁয়ের নদার মত নদী কোন দেশেই নেই। দক্ষিণ-ডাঙ্গার নদীর ঘাটে যদি কোন দিন চান করেন, চিরদিন ধ'রে আমাদের সেই নদীর কথা আপনার মনে থাকবে। এ-পার থেকে ও-পার তার কি সুন্দর। বর্ষার সময়—"

"বেলা হয়ে গেল—বাসায় যাও। বাসায় আর আছে কে তোমার ?

"আজ্ঞে, একটি খোকা, একটি খুকী আর স্ত্রী।"

"বলছ, এক পয়সাও সম্বল নেই, চার-চারটি প্রাণীর তা হ'লে চলে কি ক'রে ?"

"গোপাল চালিয়ে দেন—থুড়ি ! বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে—নাম ক'রে ফেলেছি ! যা বল্লুম, ও নয় ;—ও নয়—এমনি চ'লে যায়—চ'লে যায় !"

গোবর্দ্ধন আর তথায় দাঁড়াইল না। ঐ কথা বলিতে বলিতেই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি সে বাসায় না গিয়া গঙ্গার ধারে একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সেখানে বসিয়া কাটাইয়া অপরাহ্নে যখন সে বাসায় আসিল, তখন মায়া তাহার ক্লান্ত দেহ, শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"সমস্ত দিন কোথায় ছিলে বল ত ?"

"এই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, আর দেখছিলুম।"

"কি দেখছিলে ?"

"তাঁকে।"

"কা'কে ?"

গোবর্দ্ধন মৃদুস্বরে গাহিয়া উঠিল—

"(সেই) কাল সখা, ব্রজের বাঁকা
আমার গোপাল ধন।
(আমার) বুক ভ'রে সে দাঁড়িয়ে আছে
বুকের নারায়ণ।

তুমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছ না, মায়া ?—ঐ যে গো, মানকী-বিলের ধারে ধারে গোপাল আমার ছুটে ছুটে খেলা করছে! ওকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়। পিছু ফিরে চায়, আর হাসতে হাসতে ছুটে যায়। ঐ যে গো—বোষ্টমপাড়ার কদম আর কেষ্টচুড়ো গাছগুলোর তলায়, ছেলেদের সঙ্গে কাণা-মাছি খেলছে। দেখ দেখ, একবার দেখ মায়া, গোপাল ব'লে চিনতে পারে কার সাধ্যি! যেন কা'দের একটা ছেলে!

(সুর) চরণে নূপুর বাজে রিনি-ঝিনি
ছুটে ছুটে ঐ খেলে।
ধরিতে পারি না, ধরা ত দেয় না
কা'দের দুষ্টু ছেলে।"

মায়া মেজের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার দেহ ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল: গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"হ্যাঁ গা, এ রকম করছ কেন? এ সব কি বলছ তুমি? কিছু খেয়েছ-টেয়েছ না কি? তেল মেখে চান ক'রে

এস দেখি, সমস্ত দিন যে তোমার নাওয়া-খাওয়া হয় নি! কি সর্ব্বনাশ তুমি ঘটাবে, জানি না।”

“সর্ব্বনাশ ত ঘটবেই। গোপাল যে আজ এক মাস—না-স্নান না-খাওয়া—সর্ব্বনাশ হবে না? আমি কিন্তু যত দিন ছিলুম, কোন দিনই তাকে উপবাসী রাখি নি। দুষ্টুকে তিন দিন তালা বন্ধ ক’রে রেখেছিলুম বটে, কিন্তু খাওয়া বন্ধ ক’রে রাখি নি। দোকান থেকে বাতাসা কিনে, আমার শোবার ঘরের ভেতর খেতে দিয়ে, শেকল বন্ধ ক’রে, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তার পর শেকল খুলে ঢুকে দেখি,—গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মায়া,—গোপাল আমার ভাগ মধ্যে থেকে দু’চারখানা খেয়েছে। এ কথা তোমায় কোন দিনই বলি নি, মায়া। সে আমার কাছে ছাড়া আর কা’র কাছে খায় না। আমার ২১ বছরের গোপাল! আমার ৪০ বছরের শিমুল-গাছ—গোপাল—গোপাল—গোপাল—গোপাল!

(সুরে)

আমার বুকভ’রে সে দাঁড়িয়ে আছে
বুকের নারায়ণ।”

মায়ার সমস্ত দেহ অবশ হইয়া আসিল। তাহার চোখের সম্মুখে অন্ধকারে ছাইয়া গেল। সে নির্ব্বাক হইয়া উন্মত্ত স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

*   *   *

ভবানীপুরের এক মস্ত ধনীর বাড়ী।

বাহিরের একখানা ঘরের মধ্যে দুই চারিজন বাবু চা-পান করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিয়া কহিল—"গোপালকে দেখেছ তোমরা? আমাদের শিমুল-গাঁয়ের গোপাল?"

বাবুদের এক জন বলিয়া উঠিলেন—"আবার আজ পাগলামী করতে এসেছ?"

"বল না.—গোপালকে দেখছ কেউ? শিমুল গাঁয়ের গোপাল? ঐ চাটুয্যেদের মন্দিরে থাকে? দেখেছ কি?"

বাবুটি ভৃত্যের উদ্দেশে হাঁক দিলেন—"ওরে, শীগগির পাগলাটাকে—"

"পাগল নই, বাবা, পাগল নই;—চলে যাচ্ছি। আমার কি বসে দাঁড়াবার সময় আছে? আজ একমাস তার স্নানাহার হয় নি, তার খবর রাখ?"

গোবর্দ্ধন যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল, তেমনই ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তার উপর গিয়া দাঁড়াইল। এই কয় দিনেই এ অঞ্চলের লোকেরা তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক সেখানে জড় হইল। কেহ বলিল,—"অ পাগলা, ঐ তোর

গোপাল গাছে উঠছে।" কেহ বলিল,—"হুগলী জেলার কোথায় কোন্ গোপালের মুখ বেঁকে গেছে, সেই মুখ-বাঁকা গোপালই তোর না কি?" কেহ বলিল,—"ঐ তোর গোপাল মোটর ছুটিয়ে পালাচ্ছে; ধর্—ধর্—ধর্ ধর্।"

গোবর্দ্ধন গান ধরিল—

"গোপাল আমার, ছুটে চ'লে যায়,
ছুটে পুনঃ ফিরে আসে,
কে পারে ধরিতে, গোপালে আমার,
যদি নাহি দেয় ধরা সে।"

"অরে অ পাগলা!"

গোবর্দ্ধন তখনও গানের চরণটি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল কহিল—"আমি পাগল, নই, বাপধনরা—পাগল নই। একটু-খানি আমায় খারাপ করেছে, আমার ঐ গোপাল! তাকে তোমরা চেন না বাপধনরা—চেনো না। যদি চিনতে, তা হ'লে বুঝতে, তাকে ছাড়া হয়ে থাকলে, মাথার ঠিক থাকে না। নইলে, আমি পাগল নই; তার কথায় পাগল হয়ে পড়ি। আমার ২১ বছরের গোপালকে আবার যে দিন ধরতে পারব, সে দিন আমি ভাল হয়ে যাব। কিন্তু সে বড্ড পালিয়ে পালিয়ে রয়েছে।" বলিয়াই আবার সেই গানটি গাহিতে গাহিতে কালীঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল।

ও দিকে সেই সময়ে আর একটি লোক কালীঘাটময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি—চাটুয্যেদের মেজকর্ত্তা। অনেক কষ্টে অনেক খুঁজিয়া, তিনি হালদার লেনে গোবর্দ্ধনের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বাসায় গোবর্দ্ধন ছিল না। মেজকর্ত্তা মায়াকে চিনিতেন। মায়া মেজকর্ত্তার সম্মুখে বাহির হইত এবং কথাও কহিত। মায়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, বসিবার আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর, বাবা?" মেজকর্ত্তা কহিলেন—"বামুনঠাকুর কোথা মা? আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। যে দিন থেকে বামুনঠাকুর চ'লে এসেছে, সেই দিন থেকে গোপাল আর ভোগ নেন না, মুখ বাঁকিয়ে রয়েছেন। শীগ্‌গীর বল মা, বামুনঠাকুর কোথা? কত খুঁজে যে আজ তোমাদের সন্ধান পেয়েছি!"

তার পর মেজকর্ত্তা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাদের চলিয়া আসিবার পর হইতে নূতন বামুনঠাকুর ভোগ দিতে গেলে, গোপাল তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লয়েন। সে বাঁকা মুখ আর গোপাল সোজা করেন নাই। সংবাদ পাইয়াই মেজকর্ত্তা শিমুল-গাঁয়ে ছুটিয়া যান। তার পর আরও সকলে আসিয়া পড়েন। কিন্তু গোপালের সেই বাঁকা মুখ। তখন গ্রামশুদ্ধ সকলে কহিল—"গোপাল গোবর্দ্ধনেরই। তার গোপাল তাকে দেওয়া হোক্, নইলে কাহারও ভাল নেই। চাটুয্যে-বংশ উৎসন্ন

যাবে—শিমুল গাঁ ধ্বংস পাবে।" সেই দিনই মেজকর্ত্তা চুঁচুড়ার রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়া গোপাল ও গোপালের দরুণ ১০৮ বিঘা দেবোত্তর গোবর্দ্ধনের নামে দলীল রেজেষ্ট্রী করিয়া আনেন। তার পর সেই দলীল হাতে করিয়া গোবর্দ্ধনের খোঁজে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। দিনের পর দিন তিনি কলিকাতার চারিদিকে গোবর্দ্ধন ঠাকুরের সন্ধান করিয়া বেড়ান, কিন্তু কোথাও সন্ধান পান না। অবশেষে আজিই প্রাতে তাহার সন্ধান জানিতে পারিয়া, মেজকর্ত্তা দলীলখানি হাতে লইয়া কালীঘাট ছুটিয়া আসিয়াছেন।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মায়া শিহরিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, সে চিত্রার্পিতার ন্যায় ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। মেজকর্ত্তা তাহার হাতে রেজেষ্ট্রী দলীলখানা দিয়া কহিলেন—"এই নাও মা। গোপাল আর গোপালের সম্পত্তির অধিকারী তোমরাই। এই অধিকার দেবার জন্যেই ছুটে ছুটে আসছি।"

"আমিও যে ছুটতে ছুটতে আসছি। আমার গোপাল?" দ্রুত-পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধন মেজকর্ত্তাকে একবারে জাপ্টাইয়া ধরিল। কহিল—"আমার গোপাল! আমি যে তার জন্যে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি।"

"তোমারই গোপাল, বামুনঠাকুর, তোমারই গোপাল!

গোপাল আর কারও নয়। চল, তোমার গোপাল তুমি নেবে চল। তুমি গাঁ ছেড়ে আসা অবধি তোমার গোপাল অনাহারে রয়েছে।"

মেজকর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিয়া, অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তাহার মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া গোবর্দ্ধন কহিল—"অনাহারে রয়েছে? গোপাল? আমি চলে আসবার পর থেকে?—চল—চল—চল—চল—চল!"

গোবর্দ্ধন ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, মেজকর্ত্তা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

পরদিন গোবর্দ্ধনের পুনরাগমন-বার্ত্তা শুনিয়া গাঁয়ের লোকেরা গোপালজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিল।

সকলে দেখিল,—গোপালের বাঁকামুখ সোজা হইয়া গিয়াছে।

—:*:—

মাটির স্বর্গ

মণিপুর হইতে হঠাৎ শ্রীপদ ভটচাযের এক পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে—ভাইপোটির পৈতা, তোমার আসা চাই-ই। দেশে আসা ত একরূপ বন্ধই করিয়াছ, এই উপলক্ষে একবার আসিও। কবে হয় ত চক্ষু বুজিব, তার আগে চোখ চেয়ে দু'জনে দু'একটা কথা-টথা কহিয়া লইব। তোমার বড় সাধের মণিপুর, মায়া কাটাইলে কি করিয়া?—ইত্যাদি।

শ্রীপদ আমার বাল্যবন্ধু। কেমন করিয়া, কি কথা দিয়া, তাহাকে বুঝাইব যে মায়া কাটাই নাই। এমন দিন খুব কমই গিয়াছে, যেদিন মণিপুরের কথা মনে করি নাই। আমার বাল্য এবং যৌবনের কতক ভাগ মণিপুরেই কাটিয়াছে। অর্থাৎ জীবনের মধুময় সময়টাই সেখানে কাটিয়াছে—যখন জীবনটা ছিল শুধু স্বপ্নময় মাধুর্য্যভরা আর সৌন্দর্য্যভরা।

শ্রীপদকে পত্রোত্তর দান করিলাম—আমি যাইতেছি। এবং যথাদিনে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। ই-আই-আর-এর বড়

গাড়া ছাড়িয়া একটি ছোট লাইনের গাড়ীতে আমাদের দেশে যাইতে হয়। লাইন ছোট, তার ষ্টেশনগুলিও ছোট। যে ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের গ্রামে যাইতে হয়, সে ষ্টেশনটি বোধ হয় সব-চেয়ে ছোট। নামটা কিন্তু তার খুব বড়—বারভদ্রপুর। অপরাহ্নবেলায়—সূর্য্য যখন ষ্টেশনের পশ্চিম দিকস্থ দেড়েলা গ্রামের কতকগুলা তাল, তেঁতুল, ঝাউ, বাদাম, প্রভৃতি গাছের আড়ালে নামিয়া উঁকি দিতেছিল, সেই সময় একটা আনন্দ ও তৃপ্তি বুকে লইয়া গাড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। সামনেই দাসু ময়রার দোকানটি ঠিক তেমনই আছে। আরও দু'একখানা নূতন দোকান হইয়াছে। দাসুর দোকানে দেখিলাম, দীর্ঘদিনের পর তাহার নব সংস্করণে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ বাহিরের দাওয়ার একাংশ ঘিরিয়া চা'য়ের একরত্তি একটা দোকান খোলা হইয়াছে। একটা ক্যানেস্তারা-কাটা ছোট টীনের উপর আলকাতরার পোঁচড়া দিয়া লেখা একখানা সাইনবোর্ডও ঝাঁপের গায়ে ঝোলানো হইয়াছে—'গরম চা'। ও-পাশে ভাদুইপুরের অক্ষয় তাঁতীর ছেলে একটা ছোট-খাট মনিহারী দোকান খুলিয়াছে। তাহাতে যাহা আছে, সে-সব দ্রব্য বীরভাদুইপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণের চৌদ্দপুরুষের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কাহারো কখনো আবশ্যক হয় নাই। এখন হইয়া থাকে। তাহাতে আছে—সাবান, সেণ্ট, রেশমী ফিতা, ঝুমকো,

তরল আলতা, মাথার ক্লিপ, স্নো, গন্ধ তেল, টর্চ আলো, লবনজুস, বিসকুট, চকলেট্, কেমিকেলের কাচ-বসানো আংটী, দুল, ফাউনটেন পেন প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, সকল জিনিষই নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অত্যন্ত কমদামী। ছোট আলমারিটার মধ্যে দেখিলাম, একটা 'সু-হর্ণ' (Shoe horn) ঝুলিতেছে। ভাবিয়া পাইলাম না যে, এ-দ্রব্যটির গ্রাহক এখানে কে? তাঁতিদের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, তিনটে এনেছিলাম —ছিরে বাগ্‌দীর ছেলে একটা আর মতি গয়লার ভাগনে একটা কিনে নিয়ে গেছে। এই কথাটার সূত্রে একটু ভাবিতেছি, তখন ছেলেটি পুনরায় কহিল. ওরা ত কখন জুতো পায়ে দেয় নি, জুতো ছিলও না। ঐটে কিনে নিয়ে যাবার পর, ধান বেচে দু'জনে জুতো কিনেচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম; আচ্ছা—তোমার বেশার ভাগ খদ্দের কা'রা?

বেশার ভাগ খদ্দের ঐ ওরাই। বাগ্‌দা, হাড়ী, দুলে, কাওরা কামার, কুমোর, চাষি-ভুষি—এদের জন্যেই ত দোকান আমার চলচে।

ভাবিলাম, পাশ্চাত্য উন্নতির আলো ভদ্রশ্রেণীর লোকদের উজ্জ্বল করিবার পর, এইবার এদেরও উন্নত এবং উজ্জ্বল করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। লাগিয়া যখন গিয়াছে,

তখন ইহাদেরও তুলিয়া না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।

ধীরে ধীরে মাঠের মধ্যে নামিয়া মণিপুরের পথ ধরিলাম। ভাদুইপুরের এই মাঠটা অতিক্রম করিলেই—নদী। নদীর ও-পারেই মণিপুর। নদী—নামেই নদী। সামান্য একটু পরিসর। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সব সময়েই তাহাতে এক হাঁটু জল।

তখন বৈশাখ মাস : নদীতে জল নাই বলিলেই হয়। মনসা-তলার দহের কাছে, যেখানে নদী পার হইতে হয়, সেখানে হাঁটুও ডোবে না। সেখানে পাড়ের উপরকার সরকারদের সাত পণ জমিটায় নালু সর্দ্দার বাজতলা চষিতেছিল। আমাকে দেখিয়া জোড়হাত মাথায় ঠেকাইল। কহিল,—দা'ঠাকুর অনেকদিন পরে যে গো ? ভাল আছ ত আপনি ?

হ্যাঁ নালু। তুমি ভাল আছ ?

আপনাদের চরণের রাশীর্ব্বাদে আছি একরকম, দা'ঠাকুর !

গাঁয়ে যখন ঢুকিলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। শীতলাতলায় রক্ষিতদের দোকানে খরিদ্দারের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—কেরোসিন এক পাঁট, গোল আড়াই পো, আগে আমায় দিয়ে দাও !

—সুজিতে তোমাদের পোকা কেন গো ?

শীগ্‌গীর দাও মেজকর্ত্তা,—আধলার ঝাল-মশলা আর আধলার পান-সুপোরি।

—বোম্বাই আর মতিহারী দু'য়ে মিলিয়ে একছটাক! হাত চালাও না, রক্ষিতের পো!

—এক নম্বর 'কাতা' কি দর গা?

একটা খালি কাঁসি বাজাইতে বাজাইতে ন্যুরো বোষ্টমের ছেলে, সারখেলদের খামার-বাড়ীর পাশের পথ ধরিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল—

ঘরে ঢেঁকা হোল বিষম দায়
(কালার) বাঁশী শুনে রইতে নারি—
এ কি আমার হোল হায়!

ছেলেটার গলা ভারি মিষ্টি। বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই সে তাহার হাতের কাঁসি বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। স্ফূর্ত্তির কারণও ছিল। অর্থাৎ সময়টা মধুর। আকাশের গায়ে বেশ বড় চাঁদ উঠিয়া চারিদিকে তরল আলো ছড়াইয়া দিয়াছিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া যে বাতাসটি বহিতেছিল, তাহাও অতি সুন্দর; যেন একটা মাদকতা মিশানো।

ও-পাড়া ছাড়াইয়া শ্রীপদর বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, তাহার বাহিরের ঘরখানির দরজা বন্ধ। দরজার জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে ভিতরে আলো দেখা যাইতেছে। মৃদু

করাঘাত করাতে, ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল—কে ?

—আমি সুরেন।

আরে এস—এস। ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় পূর্ণ। যে-দ্রব্যটির ধোঁয়া, তাহা যদিচ তামাকেরই বটে, তবে ছোট-খাট তামাকের নয়! 'বড় তামাকে'র ছোট কলিকাটি পারিষদ ভূষণ নাপিতের হাতেই ছিল। শ্রীপদ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, ওতে আর কিছু নেই, রেখে দে। আমি কহিলাম—পদ, তোমার সব ভাল, কিন্তু এইটেই খারাপ। এই জঘন্য জিনিষটাকে আর ছাড়তে পারলে না ?

বেশ গম্ভীর হইয়া শ্রীপদ কহিল, ওটিকে ছাড়লে পৃথিবীকেই ছাড়তে হোত! গাঁয়ে যে ম্যালেরিয়ার হিড়িক পড়লো, গুরুদেব বললেন, বাঁচতে চাও ত এই তিনটে দ্রব্যের একটাকে আশ্রয় করতে হবে; অর্থাৎ মদ, আফিং আর গাঁজা। নইলে এই দারুণ ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আর উপায় নেই। গুরুদেবের বাক্য অব্যর্থ। তার সাক্ষী দেখ না কেন, গাঁয়ের সকলেই ত একে একে মরেচে, বেঁচে আছি—আমি, ও-পাড়ার শশী আর তোমাদের পাড়ার রাখাল।

—ওরা দু'জনও কি গাঁজা খায় নাকি ?

না। শশীর হোল আফিং আর রাখালের—জলপথ। আমি ও-সব দিকে না গিয়ে এই দিকেই এলুম। এ হোল স্বয়ং দেবাদিদেবের নেশা। কিন্তু যাই বল, গুরুদেবের অকাট্য যুক্তিকে বলিহারী যাই। ম্যালেরিয়ার ধাক্কায় সকলকেই প্রায় পটল তুলতে হোল, তুলে ভোগ আর কেউ করতে পারলে না। ভোগ করচি এই আমরা—ক'জন।—অতঃপর হাত পাখাটা দিয়া বাতাস করিয়া ঘরের সঞ্চিত ধূমরাশিকে শ্রীপদ বাহির করিয়া দিতে লাগিল।

পরের দিন প্রত্যূষে উঠিয়া নদীর ধারের পথ ধরিয়া বরাবর যেখানে মণিপুরের সীমানা, আর যার পরপারে দাইপাড়া গ্রাম, সেইখানে গেলাম। সেখানে একটি পাকা পোল আছে। বাল্যে, যৌবনে, এই পোলের উপরে, নীচে চতুঃপার্শ্বে খেলা করিতাম, বসিতাম। আজও আসিয়া পোলের উপরে বসিলাম। বৈশাখী প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস নদীজলে ভিজিয়া আসিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল। দেখিলাম, সেই নদী, সেই পোল, ও-পারের সেই দাইপাড়ার চাষাদের ছোট ছোট কুটীর, মরাই, আখের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, এ-পারের সেই সব ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পোলের গোড়ার সেই প্রাচীন বটগাছটি, আর তার পাশ দিয়া নদীমধ্যে নামিবার সেই কাঁচা ঘাটটি—সবই ঠিক তেমনিই আছে। একদিন ছিল, যেদিন তাহারা আমারই ছিল।